# শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

প্রদ্যোত গুপ্ত

চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোম্পানী

১১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

প্রকাশক :—
শ্রীপরেশ চক্রবর্ত্তী
১১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মূল্য দুই টাকা

মুদ্রাকর :—
শ্রীপ্রফুল্ল কুমার বক্সী
নিউ প্রিণ্টার্স,
২০৯-সি, বিধান সরণী,
কলিকাতা-৬

—পিতৃদেবকে—

* রাণী রাসমণি
* শ্রীমা সারদামণি
* ভগিনী নিবেদিতা
* স্বামী বিবেকানন্দ
* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

# শ্রীরামকৃষ্ণ

## প্রথম স্তবক

দশ বিশ হাজার নয়, মাত্র শ'দেড়েক বছর আগের কথা। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ মর্তধামে এসেছিলেন। তিনি বলতেন, নাম আর নামী অভেদ। যে রাম সে কৃষ্ণ, সে এবার রামকৃষ্ণ।

অসংখ্য জীবনীকার তাঁর জীবন কাহিনী রচনা করেছেন, কিন্তু ঠাকুরের এই রামকৃষ্ণ নাম প্রাপ্তি সম্বন্ধে অনেকেই একমত হতে পারেন নি।

ঠাকুরের পূর্ব নাম গদাধর। গদাধরের এই নামকরণ কবে কে করেছেন, সে বিষয়ে নানা জনের নানা মত।

স্বামী বিবেকানন্দ এই নাম রহস্যে কোন আলোকপাত করেন নি। ঠাকুরের প্রথম শিষ্য রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় ঠাকুরের জীবনী রচয়িতাদের মধ্যে প্রথম। তিনি সর্ব প্রথম ঠাকুরের জীবনী রচনা করেন। তিনি লিখেছেন।

'তাঁহাকে সবাই গদাই বলিয়া ডাকিত ; কিন্তু প্রকৃত নাম রামকৃষ্ণ ছিল।'

দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখেছেন।

'এখন হইতে আমরা গদাধরকে শ্রীরামকৃষ্ণ নামে অভিহিত করিব'।

ঠাকুরের ভক্ত অক্ষয়কুমার সেন লিখেছেন—

'গুরুদত্ত নাম রামকৃষ্ণ নাম খ্যাত।<br>রামকৃষ্ণ পরম হংস ভুবনে বিদিত॥

গুরুদত্ত নাম হলে, এই গুরু কে? পিতা না ভৈরবী যোগেশ্বরী সাধন ক্ষেত্রে যোগেশ্বরী ছিলেন ঠাকুরের প্রথম গুরু।

সেন মহাশয় লিখেছেন—

'করতালি দিয়া মাগী নেচে নেচে বলে।
এইত গৌরাঙ্গদেব নিতাইয়ের খোলে॥
হৃদয় আনন্দ ময় তাহার উচ্ছ্বাসে।
যথা-তথা পুরী মধ্যে এই বার্ত্তা ঘোষে॥
এই রামকৃষ্ণ সেই গৌর গুণধাম।
সাব্যস্তে সহস্রদেয় শাস্ত্রের প্রমাণ॥'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত রচয়িতা বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল লিখেছেন—'বোধ হয় পরম ভক্ত মথুরনাথ রামকৃষ্ণ নাম রাখেন। পরম পুরুষ রচয়িতা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মতে সন্ন্যাস দীক্ষা দানের সময় শ্রীমৎ তোতাপুরী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নাম প্রদান করেন'।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—

'গদাধর নামের পরিবর্ত্তে কখন যে তিনি রামকৃষ্ণ নামে পরিচিত হন, তার কোন সঠিক ইতিহাস আজও পর্যন্ত জানা যায়নি।'

পরম পুরুষ গ্রন্থে লেখা আছে—

শিষ্যকে নতুন কৌপীন আর কাষায় দিল তোতাপুরী। বললে, এবার তোমাকে নতুন নাম দেব।

আমার নামও বদলে যাবে?

শুধু নাম নয় পদবীও বদলে যাবে। তুমি এখন সম্পূর্ণ নতুন। নতুন দেশে তুমি জন্মালে।

গদাধর তাকিয়ে রইল আবিষ্টের মতো।

হ্যাঁ এখন থেকে তোমার নাম রামকৃষ্ণ। সন্ন্যাসে যখন দীক্ষা নিলে, অর্থাৎ কিনা যখন শ্রীতে অধিষ্ঠিত হলে, তুমি শ্রীরামকৃষ্ণ। আর পদবী? পদবী পরমহংস। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

# ঠাকুরের বংশ তালিকা
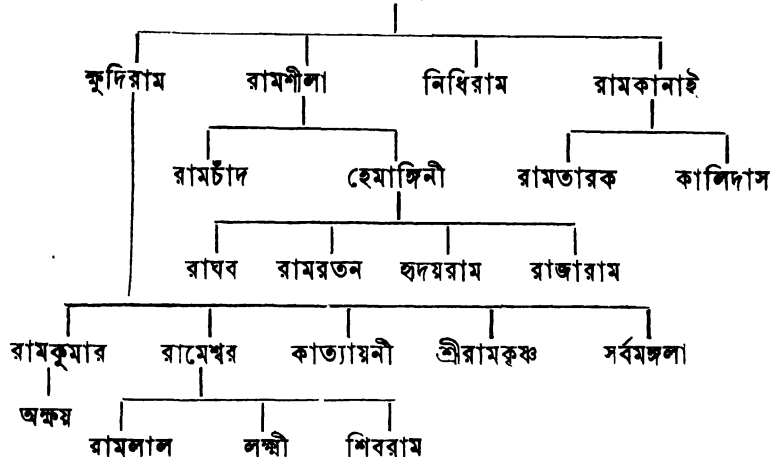
বংশ তালিকা দেখে মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণ গদাধরেরই আর একটি নাম ছিল। কারণ এই বংশের প্রায় সকলেরই নামের আদি অথবা অন্তে রাম শব্দটি আছে। গদাধর জন্মাবার আগে ক্ষুদিরাম স্বপ্ন দেখেছিলেন যে ভগবান গদাধর তার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করবেন। এজন্যই ছেলের নাম রাখেন গদাধর। অনেকেরই একাধিক নাম থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরিহাস ছলেও মিথ্যা উচ্চারণ করতেন না, তাঁর উক্তি থেকে বুঝা যায় বেদান্ত সাধনার বহু পূর্ব থেকেই দক্ষিণেশ্বরে তিনি গদাই ও রামকৃষ্ণ এই দুই নামেই পরিচিত ছিলেন।

রামতারক (হলধারী) কর্মসন্ধানে দক্ষিণেশ্বরে এলে স্বপাক খাবেন শুনে মথুরবাবু বলেছিলেন—'কেন তোমার ভ্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভাগিনেয় হৃদয়তো ঠাকুর বাড়ীতে প্রসাদ পাইতেছে।'

ঠাকুর বলছেন হলধারী তাঁর পূজা দেখে মোহিত হয়ে কতবার বলেছে—'রামকৃষ্ণ এবার তোকে চিনেছি।'

হৃদয় বলেছে,—'মামা' এই তুমি বল রামকৃষ্ণকে ভূতে পাইয়াছে···
রাসমণির বরাদ্দ লিপিতে আছে—

শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য···৫৲। রামকৃষ্ণ—কাপড় ৩ জোড়া ৪॥০—এ লিপি তৈরী হয় তোতাপুরীর কাছে দীক্ষা নেবার চার বৎসর পূর্বে। শ্রীরামকৃষ্ণ নাম রহস্য নিয়ে সকলেই অনুমানের উপরে নির্ভর করেছে। ঠাকুরের জীবিতকালে তাঁর জীবনী রচিত হয় নি, এজন্য জীবনীকারগণ নানা রূপ প্রমাণ ও অনুমানের উপরে নির্ভর করে তাদের অভিমত লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু রাণী রাসমণির বরাদ্দলিপি অনুমান নয়, 'এভিডেন্স'। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি শ্রীরামকৃষ্ণ, ঠাকুরের পিতৃদত্ত নাম। ঠাকুরের বংশাবলীও সে স্বাক্ষ্য দেয়।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নাম রহস্য নিয়ে যতই মতদ্বৈধ থাক, ঠাকুরের উপদেশামৃত ও কথা সংগ্রহের মূল্য সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ নাই। বুদ্ধদেব যেমন সংস্কৃতে উপদেশাবলী প্রচার না করে সাধারণ লোকের বোধগম্য করে পালি ভাষায় প্রচার করেছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণও সেরকম অতি সহজ কাহিনীর অবতারণা করে উপদেশামৃত বর্ষণ করেছেন।

ঠাকুর যেমন ছিলেন সহজ সরল, উপদেশগুলিও তাই। শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেরই বোধগম্য।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন—

জল, water, পানি। কেউ ঘাটে আসে water নিতে, কেউ আসে পানি নিতে, কেউ আসে জল নিতে। হিন্দুরা জল খায়, ইংরাজেরা water খায়, মুসলমানেরা পানি খায়। উদ্দেশ্য সকলেরই এক তৃষ্ণা নিবারণ। সেরকম ঈশ্বরকে, আল্লা বল, God বল, ভগবান বল তিনি ঐ ঘাট ভরা জলের মত। যার যে নামে ইচ্ছা ডেকে ঘটি ভরে তুলে নিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করে। রাম বল, যীশু বল, রহিম বল কেউ ভিন্ন নয়—একই ঈশ্বর।

ঠাকুর নিজে ছিলেন গৃহী। গার্হস্থ্য আশ্রম তিনি ত্যাগ করেননি।

প্রাচীন ভারতে মুনি ঋষিরা যেরকম সংসারে থেকেই ব্রহ্মদর্শন করেছিলেন ঠাকুরও সেরকম সংসারে থেকে দিব্য দর্শন লাভ করেন।

সন্ন্যাসীরা জ্ঞান পন্থী, গৃহীরা ভক্তি পন্থী। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তোতাপুরীর কাছে সন্ন্যাসী দীক্ষা নিয়েও কাষায় কৌপীন গ্রহণ করেন নি। ধুতি জামা পরতেন। আচারে ব্যবহারে গৃহী ছিলেন, অন্তরে ছিল সন্ন্যাসীর ত্যাগ। গৃহ ত্যাগ করে ঈশ্বর ঈশ্বর করে কাউকে তিনি ঈশ্বর খুঁজে বেড়াতে বলেন নি। ঠাকুর বলতেন—

সংসার করা দোষের নয়, তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখবে। ভগবানের নাম করলে দেহ মন সকলই শুদ্ধ হয়ে যায়।

আত্মহত্যা করা পাপ। ফিরে ফিরে সংসারে এসে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। উট কাঁটা ঘাস ভালবাসে। খাবার সময় মুখ দিয়ে রক্ত পড়ে। উট তবুও খায়। সংসারী লোক এত শোক দুঃখ পায় তবুও সংসারের মায়া ছাড়ে না।

টাকা হলে মানুষ আর একরকম হয়ে যায়। একটা ব্যাঙের একটা টাকা ছিল। একদিন একটা হাতী ব্যাঙের গর্ত ডিঙ্গিয়ে গেল। ব্যাঙটা রেগে বেরিয়ে এসে হাতীকে লাথি দেখিয়ে বলল, তোর এত বড় সাহস যে আমায় ডিঙ্গিয়ে যাস? টাকার অহঙ্কার এরকম। কোন হিত বিবেচনা থাকে না।

ঘরে যদি আলো না জ্বলে, সে হচ্ছে দারিদ্র্যের চিহ্ন। তাই হৃদয়ের মধ্যে আলো জ্বালতে হয়। সে হচ্ছে জ্ঞানের আলো।

চোর চোর খেলবার সময় বুড়ী ছুঁয়ে দিলে আর ভয় নাই। একবার পরশ মণিকে ছুঁয়ে সোনা হলে হাজার বছর পরেও তুমি সোনাই থাকবে।

মন হচ্ছে দুধের মত সাদা। সেই মনকে যদি সংসার জলে রাখ তাহলে দুধে জল মিশে যাবে। কিন্তু দুধকে দই পেতে মাখন তুললে সে মাখনে কখন জল মিশে না। মনে একবার ঈশ্বর তত্ত্ব ঢুকলে, তারপর সংসার থেকে নিরাসক্ত থাকতে পারবে।

লজ্জা, ঘৃণা, ভয় তিন থাকতে নয়। এসব না গেলে সংসার থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না।

টাকার অহংকার করতে নাই। সন্ধ্যার পরে জোনাকী পোকা মনে করে আমিই জগৎকে আলো দেই। কিন্তু নক্ষত্র উঠতে দেখে তার অভিমান চলে যায়। তখন নক্ষত্র ভাবে আমি জগৎকে আলো দেই। চন্দ্র উঠলে নক্ষত্ররা লজ্জা পায়। চন্দ্র মনে করে আমার আলোয় জগৎ হাসে। যখন অরুণোদয় হয় তখন চন্দ্রও মলিন হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে চন্দ্রকে আর দেখা যায় না। ধনীরা যদি একথাগুলো মনে করে তাহলে আর টাকার অহংকার হয় না।

চিল, শকুনি অনেক উঁচুতে ওঠে, কিন্তু নজর থাকে ভাগাড়ে। অনেক লোক আছে তারা লম্বা কথা বলে, কিন্তু তাদের মন পড়ে থাকে সংসারের দিকে।

বাদলে পোকা আলো দেখলে আর অন্ধকারের দিকে যায় না। যদি একবার ঈশ্বরকে পাওয়া যায় তবে আর সংসারের দিকে মন যায় না।

যেমন অন্ধকারের ভিতরে দেশলাই ঘসতে ঘসতে দপ্ করে আলো জ্বলে ওঠে, সেই রকম ঈশ্বরের চিন্তা করতে করতে এক সময় মনে দপ্ করে তত্ত্বজ্ঞানের আলো জ্বলে ওঠে, তখন সব সন্দেহ মিটে যায়।

বাজে কাঠ যখন ভেসে যায়, একটা পাখি বসলেই ডুবে যায়। কিন্তু বাহাদুরি কাঠ যখন ভেসে যায় তখন মানুষ এমনকি হাতী পর্যন্ত ওর উপরে দাঁড়িয়ে যেতে পারে। তেমনি বাজে লোককে ধরে গুরু করলে ডুবে মরবে, আশ্রয় নেবে শক্তিমান গুরুর কাছে।

চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বটে কিন্তু তাতে আলোর ব্যাঘাত হয় না।

কচি বাঁশ সহজে নুয়ে পড়ে, পাকা বাঁশ নোয় না। জোর করে নোয়াতে গেলে ভেঙ্গে যায়। তেমনি শিশুদের মন সহজেই ঈশ্বরের দিকে টেনে নেয়া যায়। কিন্তু বুড়োদের মন টানতে গেলে মন ঈশ্বর ছেড়ে পালায়।

পুকুরে অল্প জল থাকলে আস্তে আস্তে নেড়ে জল খেতে হয়, বেশী নাড়লে জল ঘোলা হয়ে যায়। তেমনি ঈশ্বরকে পেতে হলে গুরু-বাক্য বিশ্বাস করে ধীরে ধীরে সাধন ভজন করতে হয়। শাস্ত্র নিয়ে তর্ক বিতর্ক করে বেশী আন্দোলন করলে মানুষের মন সহজে গুলিয়ে যায়।

সূর্য উদয়ের আগে দই মন্থন করলে বেশ মাখন ওঠে, বেলা হলে সে রকম ওঠে না। তেমনি ছেলে বেলায় ঈশ্বর-সাধনা করলে ঈশ্বর লাভ হয়ে থাকে, বেশী বয়সে সহজে তা হয় না।

সন্দেশের গুঁড়ো পড়লে পিঁপড়ে এসে আপনি জোটে।

ফলবান বৃক্ষ নুয়ে পড়ে।

কে কার গুরু? ঈশ্বর সকলের গুরু।

যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ।

স্ত্রীলোক মাত্রেই ভগবতীর অংশ।

বিদ্যায় বুদ্ধি শুদ্ধি করে।

যে বাড়ীতে হরি-সংকীর্ত্তন হয়, সে বাড়িতে কলি প্রবেশ করতে পারে না।

যার বিশ্বাস আছে, তার সব আছে।

উঁচুতে উঠলে সকলকেই সমান দেখায়, ঈশ্বর পেলে আর ভালমন্দ থাকে না।

ঈশ্বরে কি করে মন হয়?

ঈশ্বরের নাম ও গুণগান সর্ব্বদা করতে হয়, সৎসঙ্গ করতে হয়, ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু এঁদের কাছে যেতে হয়। মাঝে মাঝে নির্জ্জনে বসে ঈশ্বরের চিন্তা করতে হয়। প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জ্জন না হলে ঈশ্বরে মন রাখা বড় কঠিন। যখন চারাগাছ থাকে তখন তার চারদিকে বেড়া দিতে হয়। বেড়া না দিলে ছাগল গরু খেয়ে ফেলে। ধ্যান করবে মনে, কোণে ও বনে।

সংসারে কি রকম করে থাকতে হবে?

কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়; কিন্তু তার মন পড়ে থাকে আড়ায়। যেখানে তার ডিমগুলি আছে। সংসারের সব কর্ম করবে। কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখবে। তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙ্গতে হয়। তা না হলে হাতে আঠা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরের ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারের কাজে হাত দেবে।

ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায়?

হ্যাঁ, অবশ্য করা যায়। মাঝে মাঝে নির্জনে বসে, তাঁর নাম গান, বস্তু বিচার এসব করতে হয়।

দুষ্ট লোকের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করা উচিত?

ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। ভাল লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে, দুষ্ট লোকের কাছ থেকে তফাতে থাকতে হয়। বাঘের ভিতরেও নারায়ণ আছেন, তা বলে বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে না। এক বনে এক সাধু ছিলেন। তাঁর অনেক শিষ্য ছিল। একদিন তিনি শিষ্যদের উপদেশ দিলেন সর্বভূতে নারায়ণ আছে। এ কথা মনে রেখে সকলকে নমস্কার করবে।

একদিন একটি শিষ্য হোমের কাঠ আনতে বনের মধ্যে গেছে, এমন সময় শুনতে পেল, পালাও পালাও পাগলা হাতী আসছে।

সবাই পালিয়ে গেল, শিষ্য পালাল না। সে জানে যে হাতীও নারায়ণ তবে পালাবে কেন? দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে স্তব করতে আরম্ভ করল। মাহুত চেঁচিয়ে বলল—পালাও। শিষ্য তবু যায় না। হাতীটা কাছে এসে সাধুকে শুঁড়ে তুলে ছুড়ে ফেলে দিল। শিষ্যটি অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল। সব শুনে গুরু বললেন,—বাবা, হাতী নারায়ণ আসছিলেন বটে কিন্তু মাহুত নারায়ণ তো তোমায় সরে যেতে বলেছিল। যদি সবই নারায়ণ তবে মাহুত নারায়ণের কথা শুনলে না কেন?

যদি দুষ্ট লোক অনিষ্ট করতে আসে বা অনিষ্ট করে, তা হলে কি করা উচিত?

দুষ্ট লোকের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য একটু তমোগুণ দেখান দরকার। কিন্তু তা বলে যে অনিষ্ট করে তার অনিষ্ট করা উচিত নয়। এক মাঠে রাখালেরা গরু চরাত। সেই মাঠে একটা ভয়ানক বিষধর সাপ ছিল। সকলেই সেই সাপের ভয়ে অত্যন্ত সাবধানে থাকত। একদিন এক ব্রহ্মচারী সে মাঠের দিকে যাচ্ছিলেন। রাখালেরা সাবধান করে দিল, ঠাকুর মশাই ওদিকে যাবেন না, একটা সাপ আছে।

ব্রহ্মচারী বললেন, তা হোক, আমার তাতে ভয় নাই।

সাপটা তেড়ে আসতেই ব্রহ্মচারী এমন মন্ত্র পড়লেন যে সাপটা কেঁচোর মত নিরীহ হয়ে গেল। ব্রহ্মচারী বললেন—তুই আর হিংসা করবি না, তোকে মন্ত্র দেব। এই মন্ত্র জপ করলে তোর ভগবানে ভক্তি হবে।

ব্রহ্মচারী সাপকে মন্ত্র দিলেন।

সাপটা মন্ত্র পেয়ে গুরুকে প্রণাম করে বলল,—ঠাকুর কি করে সাধনা করব বলুন।

গুরু বললেন, এই মন্ত্র জপ করো, আর হিংসা করবে না।

রাখালেরা দেখল সাপটা আর কামড়াতে আসে না। মারলেও কিছু বলেনা। একদিন একটা রাখাল সাপটার ল্যাজ ধরে ঘুরপাক দিয়ে দূরে ফেলে দিল। সাপটার মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। সাপটা অচৈতন্য হয়ে পড়ল।

অনেক রাত্রে চেতনা ফিরে পেয়ে ধীরে ধীরে নিজের গর্তে চলে গেল। এক বছর পরে ব্রহ্মচারী এসে সাপের দুর্দশা দেখে বললেন,—তুই এত রোগা হয়ে গেছিস কেন?

সাপের মুখে সমস্ত কথা শুনে ব্রহ্মচারী বললেন,—তুই এত বোকা! নিজেকে রক্ষা করতে জানিস না? আমি কামড়াতে বারণ করেছি, ফোঁস করতে তো বারণ করিনি। এবার কেউ এলে ফোঁস করে উঠবি।

দুষ্ট লোকের কাছে ফোঁস করতে হয়। ভয় দেখাতে হয়, না হলে অনিষ্ট করবে।

ঈশ্বরকে কে জানতে পারে?

ঠিক কে জানবে! আমাদের যতটুকু দরকার ততটুকু হলেই হলো। আমার এক পাতকুয়া জলের কি দরকার? এক ঘটী হলেই খুব হলো। চিনির পাহাড়ের কাছে একটা পিঁপড়ে গেছে। তার সব পাহাড়টার কি দরকার। দু'একটা দানা হলেই হয়।

জীবনের উদ্দেশ্য কি?

ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য। একজন বনে গেছে কাঠ কাটতে। এক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা হয়। ব্রহ্মচারী বললেন, ওহে এগিয়ে পড়।

কাঠুরে বনে গিয়ে দেখে অসংখ্য চন্দন গাছ।

আনন্দে চন্দনকাঠ নিয়ে বাড়ী এলো। বাজারে বেচে খুব বড় মানুষ হয়ে গেল। কিছুদিন পরে মনে পড়ল ব্রহ্মচারী বলে গেছেন, এগিয়ে পড়।

লোকটি আবার বনে এগিয়ে গেল। নদীর ধারে রূপোর খনি পেল। রূপো এনে অনেক টাকা রোজগার করল।

আবার কিছু পরে এগিয়ে যেয়ে দেখে হীরে মাণিক রাশীকৃত পড়ে আছে। লোকটি কুবেরের ঐশ্বর্য্য পেল।

তাই যে যা কর না কেন, এগিয়ে গেলে আরো ভাল জিনিষ পাবে। আরো এগিয়ে গেলে ঈশ্বর লাভ হবে। ক্রমে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হবে।

কোন কাজের দ্বারা ঈশ্বর পাওয়া যায়?

সবই তাঁর কৃপার উপরে নির্ভর করে। ব্যাকুলতা থাকলে তাঁর কৃপা হয়। তবে একটা সুযোগ হওয়া চাই।

একজনের বাড়িতে খুব অসুখ, যায় যায় অবস্থা। কেউ বলে দিল, স্বাতী নক্ষত্রে বৃষ্টি পড়বে, সেই বৃষ্টির জল মড়ার মাথার খুলিতে

থাকবে। একটা সাপ ব্যাঙ তাড়া করে যাবে। কামড়াবার সময় ব্যাঙটা লাফ দিয়ে পালিয়ে যাবে, সাপের ছোবল পড়বে সেই মড়ার মাথায় স্বাতী নক্ষত্রের জলের উপরে। সেই জলে ওষুধ তৈরি করে খাওয়ালে তবে বাঁচবে।

যার বাড়ীতে অসুখ সেই লোক দিন ক্ষণ নক্ষত্র দেখে বাড়ি থেকে ওষুধ সংগ্রহ করতে বার হলো। খুঁজছে আর ব্যাকুল হয়ে মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকছে, ঠাকুর যদি তুমি যোগাড় করে দাও তবে হয়।

একদিন দেখতে পেল সত্যি একটা মড়ার খুলি পড়ে আছে। এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেল। তখন সে লোকটি বলতে লাগল, হে গুরুদেব, মড়ার খুলিও পেলাম, স্বাতী নক্ষত্রে বৃষ্টিও হলো। এবার কৃপা করে অন্য যোগাযোগ গুলিও ঠিক করে দাও।

এমন সময় দেখতে পেল একটা বিষধর সাপ আসছে।

তখন সে লোকটি মনে মনে বলতে লাগল,—হে গুরুদেব বাকী যোগাযোগটুকুও করে দাও। বলতে বলতে একটা ব্যাঙও এসে পড়ল। সাপটা ব্যাঙকে তাড়া করে গেল। ব্যাঙটাও লাফিয়ে মড়ার মাথার খুলি ডিঙ্গিয়ে পালিয়ে গেল, শাপের ছোবল খুলির ভিতরে পড়ল।

ব্যাকুলতা থাকলে সব হয!

পাপ-পুণ্য কি?

যাদের চৈতন্য হয়েছে তারা জানে ঈশ্বরই একমাত্র কর্ত্তা আর সব অকর্ত্তা। যাদের চৈতন্য হয়েছে, তাদের বেতালে পা পড়ে না, তাদের হিসাব করে পা ফেলতে হয় না। ঈশ্বরের উপরে তাদের এত ভালবাসা যে, যে কাজ তারা করে সেই কাজই সৎকাজ। যাদের চৈতন্য হয়েছে তারা পাপ-পুণ্যের অতীত।

এক জায়গায় একটা মঠ ছিল। মঠের সাধুরা রোজ ভিক্ষা করতে যায়। একদিন এক সাধু ভিক্ষা করতে করতে দেখে যে, একটি জমিদার একটি লোককে ভারি মারছে।

সাধু জমিদারকে মারতে বারণ করে।

জমিদার তখন সাধুকে মারতে লাগল। মারতে মারতে সাধুকে অজ্ঞান করে দিল। খবর পেয়ে মঠ থেকে অন্য সাধুরা দৌড়ে এলো। তারা ধরাধরি করে মঠে নিয়ে গেল।

একজন সাধুর মুখে একটু দুধ ঢেলে দিল। দুধ মুখে দিতেই সাধুর চৈতন্য হলো।

একজন বলল,—ওহে জ্ঞান ফিরে এসেছে কিনা দেখ। লোক চিনতে পারে কি না দেখ?

সে চেঁচিয়ে সাধুকে জিজ্ঞাসা করল—মহারাজ তোমাকে কে দুধ খাওয়াচ্ছে?

সাধু বলল, যিনি মেরেছেন তিনিই খাওয়াচ্ছেন।

কোনটা সৎ কোনটা অসৎ?

একটু সাধন করলেই গুরু বুঝিয়ে দেন কোনটা সৎ কোনটা অসৎ।

একটা জেলে রাত্রে মাছ চুরি করত। গৃহস্থ জানতে পেরে একদিন লোকজন নিয়ে চোরকে ঘিরে ফেলল।

জেলেটা তখন তাড়াতাড়ি ছাই মেখে একটা গাছতলায় সাধু হয়ে চোখ বুজে বসে পড়ল।

গৃহস্থ অনেক খুঁজেও চোর পেল না। দেখল একজন সাধু বসে ধ্যান করছে। পরের দিন খবর রটল একজন বড় সাধু গৃহস্থের বাগানে বসে আছে। গৃহস্থের বাগানে তখন চারদিক থেকে লোক ছুটে আসতে আরম্ভ করল। সকলের হাতে ফল, ফুল, সন্দেশ। অনেক টাকা পয়সাও সাধুর সামনে পড়ল।

জেলেটা ভাবল কি আশ্চর্য আমি সত্যকার সাধু নই, তবু আমার উপরে লোকের এত ভক্তি। তবে সত্যকার সাধু হলে আমি নিশ্চয় ভগবান পাব।

কপট সাধনাতেই সাধুর একটা চৈতন্য হলো। সত্য সাধনা হলে তো কথাই নাই।

ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?

ঈশ্বর লাভ না করলে একথা বোঝা যায় না। সাধকের জন্য তিনি নানা রূপের।

একজনের একটা গামলা ছিল। তাতে ছিল রং গোলা জল। অনেকে তার কাছে কাপড় ছোপাতে আনত। যে যে রংয়ের কাপড় ছোপাতে চাইত, লোকটি ঐ গামলাতে ডুবিয়ে তাকেই সে রংয়ের ছুপিয়ে দিত।

একজন লোক এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছিল। কাছে যেতেই লোকটি বলল, কি হে তোমার কি রংয়ের কাপড় চাই ?

সে লোকটি বলল, ভাই তুমি যে রঙে রঙেছ, আমায় সেই রঙ দাও।

একজন দেখল গাছের উপরে একটি জানোয়ার রয়েছে।

সে এসে আর একজনকে বলল, ভাই আমি গাছে লাল রংয়ের একটা জানোয়ার দেখে এলাম। লোকটি বলল, আমিও দেখছি, তবে সে লাল নয় হলদে। আবার কেউ কেউ বলল, বেগুনী, নীল, কালো। যার যেরকম মনে হয়েছে সে রকম বলছে। খুব তর্ক লাগল, শেষে তর্ক থেকে ঝগড়া। সেখানে একজন লোক বসেছিল। লোকটি বলল, আমি গাছের নিচে থাকি। জানোয়ারটাকে আমি জানি। তোমরা যা বলছ সব কথাই ঠিক। জানোয়ারটা কখন লাল, কখন সবুজ, কখন নীল নানারকম রং বদলায়।

যে ঈশ্বরের চিন্তা করে একমাত্র সেই বলতে পারে ঈশ্বর কি রকম ?

ভক্তদের তিনি নানারূপে দর্শন দেন।

কি করলে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় ?

সরল বিশ্বাসে ব্যাকুল হয়ে ডাকলেই তাঁকে লাভ করা যায়।

জটিল বালকের কথায় আছে, সে পাঠশালায় যেত। বনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, ভয় করে। মা বলে দিলেন, ভয় পেলে মধুসূদন দাদাকে ডাকবি। ছেলেটি বলল, আচ্ছা। তারপরে বনে যেয়ে ডাকতে লাগল মধুসূদন দাদা তুমি কোথায় আমার ভয়

করছে। তাকে কাঁদতে দেখে ভগবান আর থাকতে পারলেন না। হাসতে হাসতে এসে বললেন, ভয় কি, চল।

বালকের মত বিশ্বাস থাকলে ভগবানকে লাভ করা যায়।

এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে ঠাকুরের সেবা ছিল। একদিন ব্রাহ্মণ কাজের জন্য অন্য জায়গায় চলে যান। চলে যাবার সময় ছেলেকে বলে গেলেন, ওরে তুই ঠাকুরকে খেতে দিস।

ছেলেটি ঠাকুরের ভোগ দিল। ঠাকুর কিন্তু চুপ করে আছে। তখন ছেলেটি বলতে লাগল ঠাকুর এসে খাও। আমি আর কতক্ষণ বসে থাকব ? আমার যে খিদে পেয়েছে।

ঠাকুর কথা কন না।

ছেলেটি কাঁদতে লাগল।

ঠাকুর এস, বাবা তোমাকে খাওয়াতে বলে গেছেন, তুমি কেন খাচ্ছ না ?

ঠাকুর হাসতে হাসতে এসে খেয়ে গেলেন।

ঠাকুরকে খাইয়ে যখন ঠাকুর ঘর থেকে ছেলেটি বাইরে এলো, বাড়ির লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ভোগ হয়ে গেছে ?

ছেলেটি বলল, হাঁ হয়ে গেছে। ঠাকুর এসে সব খেয়ে গেছে।

কার কাছে প্রার্থনা করা উচিত ?

প্রার্থনা করতে হলে একমাত্র ভগবানের কাছে করবে।

এক ফকির বনের মধ্যে থাকত। তখন আকবর দিল্লীর সম্রাট। ফকিরের কাছে অনেকে আসত। ফকির একদিন ভাবল বাদশার কাছে যেয়ে কিছু অর্থ প্রার্থনা করি।

আকবর তখন নমাজ পড়ছিলেন। ফকির নমাজের ঘরে গিয়ে বসল। শুনল নমাজের শেষে বাদশাহ বলছেন, হে ভগবান ধনদৌলৎ দাও।

ফকির উঠে চলে যাচ্ছিল। আকবর তাকে বসতে বললেন। নমাজ শেষ করে বললেন, আপনি চলে যাচ্ছিলেন কেন ?

ফকির বলল, আমি আপনার কাছে কিছু অর্থ প্রার্থনা করব ভেবেছিলাম। কিন্তু দেখলাম আপনিও ভিখারী, আপনিও ধন-দৌলৎ প্রার্থনা করছেন। সুতরাং যদি চাইতে হয় ভগবানের কাছে চাইব।

## দ্বিতীয় স্তবক

ঠাকুর রামকৃষ্ণ ছিলেন যেন এই বাংলা দেশেরই একজন সাধারণ মানুষ। তিনি জনসাধারণের জন্য এসেছিলেন তাই তাঁর লীলা প্রকাশও হয়েছে জনসাধারণের মধ্যে। সহজ সরল মানুষ, কোন মানুষকেই তিনি কৃপা বিতরণে কার্পণ্য করেননি। পাপী, পুণ্যবান, নাস্তিক, আস্তিক সকলেই তাঁর করুণা পেয়েছে।

বুদ্ধদেব যেমন সংস্কৃত ছেড়ে সাধারণের কথ্য পালি ভাষায় তাঁর অমৃত উপদেশ দিয়েছেন, ঠাকুরও তেমনি সাধারণ লোকের মুখের ভাষায়, সাধারণের বোধগম্য করে উপদেশ দিয়েছেন। সাধারণ লোক পণ্ডিত নয়, সেজন্য গল্প ছলে তাঁর উপদেশ দিয়ে গেছেন। এ গল্পগুলি অমূল্য সম্পদ। বড় বড় পণ্ডিতেরা যে কথা বুঝাতে হিমসিম খেয়ে যান ঠাকুর দুকথায় সে সব এমন করে বুঝিয়ে দিতেন যে, বুঝতে বিন্দুমাত্রও কষ্ট হতো না। শিক্ষিত মানুষ সাধারণ মানুষের মনের জট খুলতে যেয়ে আরো ভাল করে পাকিয়ে দেন। আধুনিক জগতের মাপকাঠিতে ঠাকুর শিক্ষিত ছিলেন না। তাই সাধারণ মানুষের মনের জট অতি সহজেই খুলে দিয়েছেন। জট খুলতে গিয়ে জট পকাননি। জগতে অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের মনেই ধর্ম সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা ও অবজ্ঞা দেখা যায়। অনেকে বলেন ধর্মই আমাদের পৃথিবীতে যত গণ্ডগোলের মূল। অতএব ধর্মকে বাদ দাও। জীবনে ধর্মের কোন দরকার নাই। ধর্মের ব্যাপারতো ঈশ্বরকে নিয়ে? কেউ কি ঈশ্বরকে দেখেছ? ঈশ্বর থাকলে কেউ না কেউ নিশ্চয় দেখতে পেতেন। সুতরাং ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে চল। বিশেষ করে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের ছায়ায় যাঁরা গড়ে উঠেছেন তাঁদের সন্দেহ আরো প্রবল।

তাঁরা ভাবেন পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান যে কথা বলে সে কথাই ঠিক! ঈশ্বর—পরলোক, দৈবশক্তি এসব শুধু কল্পনা।

সিমলার দত্তবাড়ির একটি ছেলের মনেও এসব প্রশ্ন দেখা দিল। সাধারণের মত এটুকু ভেবেই ছেলেটি চুপ থাকল না। ছেলেবেলার ধর্মবিশ্বাস ও যৌবনের যুক্তি এ-দুয়ের সংঘাতে ছেলেটি অস্থির হয়ে উঠল।

কে দেবে তার প্রশ্নের উত্তর? কে করবে তার সন্দেহের নিরসন? হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্ম সব সাধুপুরুষদের কাছেই ছেলেটি আকুল প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু কেউ তার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি।

যেখানেই যায় প্রশ্ন করে, আপনি কি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেয়েছেন? কেউ বলে—দেখিনি। কেউ বলে—তাঁকে দেখা যায় না।

ছেলেটির মনের পিপাসা বেড়ে যায়। তাহলে কি এই ব্রত, পূজা, ধ্যান সবই মিথ্যা?

একদিন একজন তাকে বললেন, দক্ষিণেশ্বরে যা তোর প্রশ্নের উত্তর পাবি। রাণী রাসমণির কালী মন্দিরের সাধু সিদ্ধপুরুষ।

একদিন সুযোগ এলো, প্রতিবেশীর বাড়ীতে সেই সাধুটি এলেন। সাক্ষাৎ হলো।

একি! এযে পাগল। পাগল কি প্রশ্নের উত্তর দেবে?

কিন্তু একদিন ছুটে যেতে হলো এই পাগলের কাছেই দক্ষিণেশ্বরে।

হাঁ মশাই, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?

প্রশ্ন শুনে সাধু হেসে উঠলেন, হ্যাঁগো দেখেছি বইকি, যেমন তোমাকে দেখছি তেমনি দেখেছি। কথা বলেছি। দরকার হলে তোমাকেও দেখাতে পারি।

বলে কি! ছেলেটি অভিভূত হয়ে পড়ে। সবাই সে প্রশ্ন শুনে চমকে ওঠে, পাশ কাটায়—নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করে, এ লোকটির একেবারে কবুল জবাব! হাঁ দেখেছি, কথা বলেছি, তুমি

চাও তো তোমাকেও দেখাতে পারি। ছেলেটি চিন্তিত মনে ফিরে গেল।

এই হচ্ছেন সহজ সরল ঠাকুর রামকৃষ্ণ। সহজ মানুষ। সরল ভাষা।

বিবেকানন্দ বলেছেন,—

ধর্ম যে বস্তুর মত দেওয়া যেতে পারে তা প্রত্যক্ষ ও বাস্তব ভাবে আমার নিজের জীবনে দেখেছি। একবার স্পর্শে, একটিমাত্র দৃষ্টিতে একটা সমগ্র জীবন পরিবর্ত্তিত হয়ে যেতে পারে...আমার গুরুর স্পর্শে আমি বার বার সেই সত্যকে প্রত্যক্ষভাবে দেখেছি।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় অন্ধ, অবিশ্বাসী মনে ঠাকুর যে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে গেছেন, সে কথা তখনও যেমন লোকে বুঝেছে, এখনও বোঝে, ভবিষ্যতেও বুঝবে।

একটি নয় অসংখ্য মনে তিনি জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন। তাঁর প্রদত্ত জ্ঞান-দীপ হাতে নিয়ে বিবেকানন্দ জগৎকে আলোকিত করেছেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ গৃহত্যাগ করেননি, আবার সন্ন্যাসীও হয়ে যাননি। গৃহে থেকে দেখিয়েছেন যে, গৃহে থেকেও কি করে ভগবানের কৃপা লাভ করা যায়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবে ভগবানকে কি করে পাওয়া যায়।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ এ জীবনাদর্শের যে বাণী প্রচার করেছেন তাতে আমরা পাই হতাশায় আশা, অবসাদে উৎসাহ, অন্ধকারে আলো।

ঠাকুর ত্যাগের কথা বলে গেছেন। সে ত্যাগ গীতার নির্দেশানুযায়ী ত্যাগ। নিষ্কাম ভাবে স্বধর্ম পালন। দুঃখে নিরুদ্বিগ্ন, সুখে নিস্পৃহ, লোক-কল্যাণে সদা প্রস্তুত।

শ্রীমা লিখেছেন,—'ঠাকুর কাহাকেও সন্ন্যাসীর বাহ্য চিহ্ন ধারণ করিতে অথবা গৃহীর উপাধি ত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন নাই। কিন্তু

ঠাকুর তাঁহাদের অন্তরে ত্যাগী করিয়া গিয়াছিলেন। রোম্যাঁ রোলাঁ লিখেছেন—

I have said above that Ramakrishna the free, differing in this respect from other Gurus, had of initiation in its usual forms. (This was later a subject of reproach to vivekananda) Naren and his companions supplimented it themselves about 1888 or 1889 by proceeding to the Viraja Home, the traditional ceremony of Sannyasa, at the monastry of Baranogore. Swami Asokananda has also told me that another kind of Sannyasa is recognised in India, as superior to the farmal Sannyasa consecrated in the usual way. He who feels a strong detachment from life and an intense thirst for God, Can take the Sannyasa alone, even without any formal initiation. This was doubtless the case with the free monks of Baranagore !

ঠাকুর একদিন বলেছিলেন,—দেখবি ঘরে ঘরে আমার পূজো হবে।

আজ কোটি কোটি নরনারী ঠাকুরের পূজো করে। আবাল্য তাপস, অনাশক্ত, প্রেমের ঠাকুর গদাধর শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি গৃহী কি সন্ন্যাসী এ নিয়ে মতভেদ আছে; থাকবেও। তাঁর জীবনাদর্শ বুঝবার শক্তি আমাদের তো দূরের কথা বিবেকানন্দ পর্যন্ত বলেছেন,— ঠাকুরকে সম্পূর্ণ বুঝিনি বলেই তাঁর কথা বলতে অত ভয় পাই।

রোমাঁ রোলাঁ ঠাকুরের জীবনীগ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন—

Uhe man whose image I here evoke was consummation of two thousand years of the spiritual life of three hundred million people. He was a

little village Brahmin of Bengal, whose outer life was set in a limited frame without striking incident ...But his inner life embraced the whole multiplicity of men and Gods...'

রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে মা কালীর পূজারী রামকৃষ্ণ তখন বিভিন্ন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। কিন্তু তখনও তাঁকে বেশী কেউ বুঝতে পারেনি। কেউ বলে পাগল, কেউ বলে মাতাল, কেউ করে বিদ্রূপ।

ঠাকুর বলতেন যত্র জীব তত্র শিব। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী হয়েও তিনি শূদ্রানীর হাতের ভিক্ষা গ্রহণ করেছেন। আত্মীয় স্বজনের তীব্র কঠোর প্রতিবাদেও সঙ্কল্পচ্যুত হননি।

জগন্মাতার চরণে সব নিবেদন করেছিলেন ঠাকুর।

যশ, অপযশ, সুখ-দুঃখ, জ্ঞান-অজ্ঞান, পাপ-পুণ্য, ভূত-ভবিষ্যত কিছুই তিনি নিজের জন্য রাখেননি। সবই সমর্পণ কবেছিলেন জগন্মাতার চরণে।

ভক্তদের বলতেন,—মাকে সব দিয়েছি, নিজের জন্য রেখেছি শুধু সত্য। সত্য কাউকে দেয়া যায় না।

তান্ত্রিক সাধনার ফলে অষ্ট সিদ্ধই পেয়েছিলেন রামকৃষ্ণ।

ইষ্টদেবী আদ্যাশক্তির বরে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী।

হৃদয় বলল,—মামা শক্তি পেলে—এবার ফলাও, কাজে লাগাও। না হলে শক্তি পেয়ে লাভ কি হলো?

ঠাকুর শুধু বললেন,—বিষ্ঠাজ্ঞানে এসব এড়িয়ে চলবি। ওসব পরীক্ষা হচ্ছে প্রলোভন।

ঠাকুর একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাম ত্যাগ করেছিলেন।

একদিন তোতাপুরী ঠাট্টা করে বললেন,—খুবতো কাম জয়ের কথা বলছ, স্ত্রীকে এনে কাছে রাখ, এক শয্যায় রাত কাটাও, তবে বুঝব।

ঠাকুর কালক্ষেপ না করে শ্রীমাকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন।

শ্রীমা তখন অষ্টাদশী তরুণী।

শ্রীমার সঙ্গে শুধু এক রাত নয়, যতদিন শ্রীমা ছিলেন ঠাকুরের সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করেছেন। ঠাকুর হেলায় কাম জয় করলেন।

শ্রীমা বলেছেন,—প্রথম রাতে ঠাকুর শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আমার সাধন পথে বিঘ্ন হতে এসেছ ?

শ্রীমা অভয় দিয়ে বললেন,—না আমি তোমার সহায় হতে এসেছি।

শ্রীমা বলতেন, এক শয্যায় শয়ন করে তিনিও কোন দিন কামের তাড়না অনুভব করেননি। তখন মন উর্দ্ধলোকে বিচরণ করত। এসব তুচ্ছ কথা মনের ত্রিসীমাতেও আসত না।

ঠাকুর জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা করেছেন।

—মা, ওকে তুমি সামলে রেখো, ও যদি আমাকে টানে তবে আমার সাধ্য নাই সে টান থেকে মুক্তি পাই।

জীবকে শিব জ্ঞান করবে।

একথা হচ্ছে ঠাকুর রামকৃষ্ণের। ঠাকুরের জীবনে এ শুধু কথার কথা নয়। তাঁর জীবন বেদে ছড়িয়ে আছে রাশি রাশি প্রমাণ।

উপনয়ন সংস্কারের পরে ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ কুমারকে অন্নভিক্ষা করতে হয়। গদাধরের ধাই মা কামারের মেয়ে। ধাই মা বলে রেখেছে তার কাছ থেকে ভিক্ষা নিতে। আত্মীয় স্বজন পাড়াপড়শী সকলেই হা হা করে উঠল। কিন্তু গদাধরের গ্রাহ্য নাই।

তিনি বলেন,—যত্র জীব তত্র শিব। সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

শিয়ড় গাঁয়ে রাখালদের সঙ্গে জলপান ভাগ করে খেয়েছেন। ছুতোরের মেয়ে খেতুর মার সাধ মেটাতে ছুতোরের ঘরে ডাল ভাত খেতেও তিনি দ্বিধা করেননি। হলোই বা ছুতোর, হলোই বা

ব্রাহ্মণেতর জাতি, কিন্তু মানুষতো। জীবন্ত জীব। জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ—জীবই তো ব্রহ্ম।

দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বাড়ির মেথর রসিক। ঠাকুর ডাকেন, রসকে। ঠাকুর ওর সেবাও গ্রহণ করেছেন।

বৈদিক সন্ন্যাসী তোতাপুরী। জাত মানেন না। জীবেই শিব দেখেন।

ধূনির আলোতে বসে তোতাপুরী রামকৃষ্ণকে অখণ্ড ব্রহ্মসত্তার অনন্ত ব্যাপ্তির কথা বলেছেন।

ঠাকুরবাড়ির মালির সাধ হয়েছে তামাক খাবে। কল্কি হাতে এলো তোতাপুরীর ধূনি থেকে একটু আগুন নিতে।

তোতাপুরী লোহার চিমটা নিয়ে তেড়ে গেলেন। মালী প্রাণ ভয়ে ছুটে পালাল।

ঠাকুর, দূর শালা, দূর শালা বলে হেসে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। তোতাপুরী বললেন, দেখলে কি অন্যায়। ব্যাটা ধূনির আগুন নিয়ে তামাক খেতে চায়? তা তুমি হাসছ কেন? হাসির কি হলো এতে?

রামকৃষ্ণ তখনও হাসছেন।

হাসছি তোমার-ব্রহ্মজ্ঞানের বহর দেখে। এই না তুমি বলছিলে, ব্রহ্ম বই দ্বিতীয় সত্তা নাই। জগতে সব কিছুতেই তাঁর প্রকাশ। আর রাগের বসে সব ভুলে তুমি মানুষটাকে মারতে ছুটলে।

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?

জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাড়িতে রোজই প্রসাদী অন্ন বিতরণ হয়। চাঁদনীতে সারি দিয়ে বসে কাঙ্গালীরাও প্রসাদ পায়। ঠাকুর কাঙ্গালীদের এঁটো পাতা পরিষ্কার করেন।

হলধারী তেড়ে এলো,—রামকৃষ্ণ তুই কি! ছত্রিশ জাতের এঁটো ঘাটছিস? তুই বামুনের ছেলে না?

রামকৃষ্ণ এঁটো মাখা হাত চাটতে চাটতে বললেন,—হলামই

বা বামুন। এরাই বা কম কি? জীবই শিব। এ হচ্ছে শিবের প্রসাদ।

তীর্থে বেড়িয়েছেন ঠাকুর। মথুরনাথ সঙ্গে নিয়ে গেছেন। দেওঘরে নামলেন। বৈদ্যনাথ দর্শন করে কাশী যাবেন। সেবার দেওঘরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ। কঙ্কালসার চেহারা নিয়ে সাঁওতাল নরনারী ক্ষুধার জ্বালায় পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। ঠাকুর মথুরবাবুকে বললেন, সেজবাবু তুমি তো মায়ের দেওয়ান। এরাও মায়ের ছেলে মেয়ে। ওদের পেট ভরে খেতে দাও, পরবার ধুতি দাও, মাথায় তেল দাও।

মথুরবাবু বললেন, এখন এই পথের মাঝে এত টাকা কোথায় পাব বাবা? তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছি, কোথায় কত টাকা লাগবে কে জানে।

শুনে ঠাকুর আর্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, তাহলে তোমরা যাও আমি এদের সঙ্গে থাকব।

মথুরবাবু ঠাকুরের ইচ্ছামত ব্যবস্থা করে দিলেন। অন্নবস্ত্র দান করে ঠাকুর জয় শিব জয় শিব বলে নাচতে লাগলেন।

ঠাকুর এসেছেন জানবাজারে। রাসমণি আনিয়েছেন। রাসমণির পুরোহিত হালদার হিংসেয় জ্বলে মরছে। কি করে লোকটা সকলকে এরকম হাত করেছে। এ বাড়ির সবাই ঠাকুর বলতে অজ্ঞান। হালদার সুযোগ খুঁজে বেড়ায়। একদিন সুযোগ পেয়ে বলল, এই বামুন বল না, কি করে বাবুটাকে বাগিয়েছিস?

ঠাকুরের তখন সমাধিভাব, অন্যমনস্ক।

উত্তর না পেয়ে হালদার রেগে গেল। ঠাকুরকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দিয়ে লাথি মেরে বলল, বলবিনে শালা? দেখ কেমন লাগে।

কথাটা কে যেন মথুরবাবুর কানে উঠাল। মথুরবাবু রেগে উঠলেন।

ঠাকুরের কাছে এসে বললেন, বাবা এসব কি শুনছি? আপনি বলেননি কেন?

ঠাকুর মথুরবাবুকে শান্ত করে বললেন, হালদার যাই করে থাক সেজবাবু, ক্ষমা করে দাও। মানুষতো। ও রাগলো বলে কি আমিও রাগবো ?

মথুরবাবু চুপ করে গেলেন।

রাগকে দমন করতে হবে প্রেমে—

অক্রোধেন জিনেৎ ক্রোধম্—ভগবান বুদ্ধদেবের কথা। অন্তিম সময়ে প্রাণঘাতী চণ্ডালকেও ক্ষমা করেছিলেন।

গিরিশ ঘোষ অনাচারী, মদ্যপ। একদিন মাতাল হয়ে গিরিশ ঘোষ ঠাকুরকে গালাগাল করলেন।

ভক্তরা ঠাকুরকে নিয়ে চলে এলেন। পরের দিনই ঠাকুর সেই গিরিশ ঘোষের বাড়িতে গেলেন।

তোমাকেই দেখতে এলাম গিরিশ। এখন কেমন আছ ?

গিরিশ ঘোষ ঠাকুরের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন।

বেড়াতে বেরিয়ে পথের উপরে পতিতাদের দেখে প্রণাম করতেন ঠাকুর। এদের মধ্যেও তো তিনিই আছেন—যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা !

অসুস্থ অবস্থায় ঠাকুর একদিন দেখলেন তাঁর দেহ থেকে আর একটি দেহ বেরিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পিঠময় অসংখ্য ঘা।

ঘা কেন ? কিসের ঘা ? ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হলেন। দেখলেন পাপীদের স্পর্শে ও ঘায়ের উৎপত্তি।

ঠাকুরের গলায় ঘা হয়েছে। অসীম যাতনা। ঠাকুরের কাতরতা নাই।

বললেন, একদিন দেখলুম পিঠময় ঘা। মা বললেন যা তা করে এসে লোকে তোকে স্পর্শ করে যায়। ওদের দুষ্কর্মের ফল তোকে ভোগ করতে হবে। তোকে ছুঁয়ে তারা উদ্ধার হয়ে গেল, কিন্তু তাদের কর্মফলের ভোগ যাবে কোথায় ? তুই তাদের উদ্ধার করছিস তুই প্রায়শ্চিত্ত করবি। গলায় ঘাও তাই। তা কি করব বলো, মানুষ তো। যা করে আসুক দূর করে দিতে পারি কি ?

শ্রীমা বলতেন গিরিশের কাজে ঠাকুর ভুগছেন, গিরিশ উদ্ধার হয়ে গেল। আগের জন্মে জগাই মাধাই উদ্ধার করেছেন এবার উদ্ধার করলেন গিরিশকে।

ঠাকুরের ভক্তরা ঠিক করল বাইরের লোককে আর ঠাকুরকে ছুঁতে দেবে না।

গিরিশ ঘোষ বলল, তাকি পারবে? ঠাকুর এসেছেন পাপী উদ্ধার করতে।

ঠাকুর ষোলজন শিষ্যকে সন্ন্যাসে দীক্ষা দিয়েছিলেন।

## ঠাকুরের শিষ্যদের নাম

### সন্ন্যাস গ্রহণের

| পূর্বে | পরে |
| --- | --- |
| নরেন্দ্রনাথ | স্বামী বিবেকানন্দ |
| রাখাল | ,, ব্রহ্মানন্দ |
| বাবুরাম | ,, প্রেমানন্দ |
| যোগেন | ,, যোগানন্দ |
| নিরঞ্জন | ,, নিরঞ্জনানন্দ |
| শশী | ,, রামকৃষ্ণানন্দ |
| তারক | ,, শিবানন্দ |
| হরি | ,, তুরীয়ানন্দ |
| কালী | ,, সারদানন্দ |
| শরৎ | ,, অভেদানন্দ |
| গোপাল | ,, অদ্বৈতানন্দ |
| লাটু | ,, অদ্ভুতানন্দ |
| সারদা | ,, ত্রিগুনাতীতানন্দ |
| সুবোধ | ,, সুবোধানন্দ |
| গঙ্গাধর | ,, অখণ্ডানন্দ |
| হরিপ্রসন্ন | ,, বিজ্ঞানানন্দ |

ঠাকুরের ত্যাগভাব এত প্রবল ছিল যে মুদ্রা তো দূরের কথা কোনরূপে ধাতুও তিনি স্পর্শ করতে পারতেন না। বিবেকানন্দ বহুবার পরীক্ষা করে সত্যতা যাচাই করেছেন। ঠাকুর এসব কথা জানতে পেরে ক্রুদ্ধ হননি, বরং প্রসন্ন হয়েছেন।

একবার ঠাকুরের কাছে কেশব সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আরো কয়েকজন বসে নানা আলোচনা করছিলেন। সেখানে বিবেকানন্দও ছিলেন। বিবেকানন্দ তখনও নরেন।

সবাই চলে গেলে ঠাকুর বললেন, জানিস কি দেখলাম? দেখলাম কেশব একটি শক্তির উৎকর্ষে জগৎ বিখ্যাত হয়েছে। নরেনের ভিতরে ওরকম আঠারোটি শক্তি আছে। কেশব ও বিজয়ের অন্তর জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল। নরেনের ভিতরে জ্ঞান-সূর্যের উদয় হয়েছে মোহের লেশমাত্র নাই।

একথা শুনে বিবেকানন্দ বললেন, মশায় করেন কি? লোকে একথা শুনলে আপনাকে পাগল ভাববে! কোথায় জগৎ বিখ্যাত কেশব সেন আর বিজয় গোস্বামী আর কোথায় স্কুলের একটা ছোঁড়া নরেন। এরকম আর বলবেন না।

ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, কি করব রে, মা যে আমাকে ঐ রকম দেখালেন। মা'তো আমাকে সত্য ভিন্ন মিথ্যা দেখান না। বিবেকানন্দ শ্লেষ করে বললেন, মা দেখালেন না নিজের মাথার খেয়ালে দেখলেন বুঝলেন কি করে?

বিবেকানন্দ ভাবলেন ইনি আমাকে ভালবাসেন তাই সব কিছুতেই আমাকে বড় দেখেন।

একবার বিবেকানন্দ বললেন,—মশায় আমাকে এত ভালবাসেন কেন? এ সব ভাল নয়। ভরত রাজার মত হয়ে না পড়েন।

রামকৃষ্ণদেব চিন্তিত হয়ে বললেন,—তাইতো রে! তোকে না দেখে যে থাকতে পারি না।

মন্দিরে চলে গেলেন। পরে মন্দির থেকে হাসতে হাসতে ফিরে এসে বললেন,—তোর কথা আমি মানিনা। মা বলছেন তোর মধ্যে নারায়ণ আছে, আমি তাকে দেখতে পাই বলেই তোর উপরে এতটান। যেদিন তা না দেখব সেদিন তোর মুখও দেখব না।

মহাসমাধির কয়েকদিন পূর্বে নাগ মহাশয়কে ঠাকুর বললেন,—

ও দুর্গাচরণ, ডাক্তার তো পারল না। তুই পারিস আমাকে সারাতে? নাগ মহাশয় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন। হাতযশও ছিল। কিন্তু পয়সা নিতেন না। ঠাকুর একদিন বলেছিলেন ডাক্তারের পয়সা অপবিত্র।

নাগমশাই একটু চুপ করে থেকে বললেন,—পারি।

নাগ মশাইর মনে পড়েছিল যযাতির কথা। মনে পড়েছিল মোগল বাদশা বাবরের কথা। তাই তিনি অবিচলিত কণ্ঠে বললেন.—পারি। আপনার কৃপায় অবিলম্বে আমি এ রোগ সারিয়ে দিতে পারি।

ভক্তরা সমস্বরে বলে উঠলেন,—পারেন?

নিশ্চয় পারি।

নাগমশাই ঠাকুরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

ঠাকুর অন্তর্যামী, চকিতে উঠে বসলেন, ঠেলে নাগমশাইকে সরিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন,—ওরে না না দুর্গাচরণ, তাকি হয়? তুই যা মনে করেছিস তা হবে না। আমি জানি তুই এ রোগ সারাতে পারিস, আত্মবলি দিয়ে এ রোগ সারাবার ক্ষমতা তোর আছে। আমি কি তা তোকে করতে দিতে পারি?

তোমাদের সব জ্বালা নিতেই তো আসা। মানুষকে ভালবেসে তাদের সন্তাপ হরণ করে নিতেই এবার এসেছি।

## তৃতীয় স্তবক

আমাকে রসে বসে রাখিস মা। আমাকে শুকনো সন্ন্যাসী করিসনে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ এই প্রার্থনা করতেন।

রসে গাঢ় শ্রীরামকৃষ্ণ কবি, শ্রীরামকৃষ্ণ শিল্পী, একাধারে কবি শিল্পী বা শিল্পী কবি।

রামকৃষ্ণের কবিতা গদ্য কবিতা।

কবি হচ্ছেন বেদবিদ ক্রান্তদর্শী। যিনি শেষ পর্যন্ত দেখেন, অতিক্রম করেও দেখেন।

আদি কবি ঈশ্বর।

তাকিয়ে দেখ ছড়িয়ে আছে তাঁর কবিতা ত্রিভুন জুড়ে। সৃষ্টিতে কবির আনন্দ, কথায় কবির আনন্দ। সেই অর্থে রামকৃষ্ণও কবি।

সকলের চেয়ে সত্য যিনি তাঁকে তিনি দেখিয়েছেন সহজ করে সুন্দর করে। গাঁয়ের পাঠশালায় কদিন পড়েছিলেন। নাম সই করতে শিখেছিলেন। মাইনে নেবার সময়ে খাতায় স্বাক্ষর দিতেন। পাঁচ টাকা মাইনের কালীর পূজারী। কথা বলেন, নিজেও অবাক হন। এত কথা জুটছে কি করে?

মা পিছন থেকে জুটিয়ে দেন।

পুরাণ পুঁথি পড়া নাই, শাস্ত্র পড়া নাই কিন্তু তবুও ভয় নাই, দ্বিধা নাই, কুণ্ঠা নাই। যে আসে সেই কথামৃত আস্বাদ করে যায়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আসেন, কেশব সেন আসেন, বিজয় গোস্বামী আসেন—আসেন বিশ্বনাথ শাস্ত্রী, প্রতাপ মজুমদার, মাইকেল, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মহেন্দ্র সরকার, মুগ্ধ হয়ে তৃপ্ত হয়ে ফিরে যান।

ব্রহ্ম কি কে বলতে পারে ?

ঠাকুর বলছেন এক কথায়। ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট।

সব কিছুইর সংজ্ঞা আছে, ছিল না ব্রহ্মের তাঁকে নাকি বাক্যে প্রকাশ করা যায় না।

রামকৃষ্ণ বললেন,—ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট—কোন দিন এঁটো হয়নি। কোন রসনা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

বিদ্যাসাগরকে একদিন একটা গল্প বললেন।

ঠাকুর বিদ্যাসাগরকে কখন বলতেন বিদ্যেসাগর কখন বলতেন ক্ষীরদ সমুদ্র। বিদ্যাসাগর নিজেকে বলতেন নোনা জলে ভরা সাগর।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ গল্প বললেন।

এক বাপের দুই ছেলে। ব্রহ্মবিদ্যা শিখবার জন্য বাবা ছেলে দুটিকে আচার্যের কাছে পাঠালেন। পাঠ সাঙ্গ করে ফিরে এলে বাপ জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রহ্ম কেমন বল দেখি ?

বড়ছেলে বেদ থেকে নানা রকম শ্লোক আউড়ে ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝিয়ে দিল। ছোট ছেলে হেঁট মুখে চুপ করে রইল।

বাপ খুশি হয়ে ছোট ছেলেকে বললেন,—বাপু তুমি একটু বুঝেছ। ব্রহ্মকে মুখে প্রকাশ করা যায় না।

ব্রহ্ম লাভ উপলব্ধির বিষয়। যে তাঁকে পেয়েছে সে বর্ণনা করতে পারবে না।

ভগবান রামকৃষ্ণ কবি রামকৃষ্ণ বলতেন—

এক নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়েছিল। জল কত গভীর মাপতে হবে। কিন্তু খবর আর নেয়া হলো না। যেই জলে নামা অমনি গলে যাওয়া। কে আর কাকে খবর দেয় ?

আবার অন্যভাবেও মাঝে মাঝে বলতেন।

আগেকার লোক বলতো, কালাপানিতে জাহাজ গেলে আর ফেরে না। কখন বলেছেন, ঘি কেমন খেলে ? না, যেমন ঘি তেমন।

একটি মেয়েকে তার সঙ্গিনী এসে জিজ্ঞাসা করল, কাল রাত্রে তোর স্বামী এলো, তার সঙ্গে কেমন আনন্দ করলি ?

মেয়েটি বলল, এ বলে বোঝান যায় না ভাই, তোর যখন স্বামী হবে তখন বুঝবি।

যে ব্রহ্মভাবে পূর্ণ সে কথা কয় না।

ঘি যতক্ষণ কাঁচা থাকে ততক্ষণই কলকলানি। পাকা ঘিয়ে শব্দ হয় না। শূন্য কলসির শব্দ হয়, ভরা কলসি নিঃশব্দ হয়। আবার যখন পাকা ঘিতে লুচি পড়ে তখন একবার ছ্যাঁক করে শব্দ করে। ভরা কলসী থেকে জল ঢাললে আর একবার শব্দ হয়।

ব্রহ্ম অস্তি নাস্তির মধ্যে থেকেও বাইরে।

ব্রহ্ম কি মাটি ? আকাশ ? সূর্য ? সমুদ্র ? না, না, না, না। যতই প্রশ্ন করবে না-এর মেলা বসে যাবে। এই সিঁড়ি ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে এগিয়ে যাও, তাহলে যেয়ে উঠতে পারবে ছাদে।

এমনি করে অর্জন কর।

ঠাকুর একদিন বললেন,—একটি মেয়ের স্বামী এসেছে, সঙ্গে এসেছে সমবয়সী বন্ধুরা। মেয়েটির সখীরা বরকে চেনে না। এক এক জনকে দেখিয়ে প্রশ্ন করে, মেয়েটি বলে না। সব শেষে যখন বরকে দেখিয়ে প্রশ্ন করল, তখন মেয়েটি হাঁ-ও বলে না, না-ও বলে না। শুধু হাসে।

আর একটি গল্প বলেছেন রামকৃষ্ণ।

রাজার কাছে যেতে হলে সাত দেউড়ি পার হতে হবে। একজন গেছে রাজদর্শনে, সঙ্গে আছে বন্ধু। প্রথম দেউড়িতে লোক লস্কর নিয়ে বসে আছে একজন। লোকটি সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করল এই কি রাজা ?

না।

দ্বিতীয় দেউড়িতেও একজন বসে, তিনিও রাজা নয়। যতই এগিয়ে যায় ততই ঐশ্বর্যের বাহার দেখে লোকটি অবাক হয়।

এমনি করে সাত দেউড়ি পার হয়ে যখন এসে দাঁড়াল, তখন তাকে আর বলে দিতে হলো না।

চোরেরা ফসল চুরি করতে আসে। তাই খড়ের মানুষ টাঙ্গিয়ে রেখেছে।

চোরেরা ভয়ে বাগানে ঢোকে না। একটা চোর সাহস করে এগিয়ে গিয়ে দেখে জ্যান্ত মানুষ নয় খড়ের মানুষ। তবুও অন্য চোরেরা যেতে চায় না, বলে ভয় করে। চোরটি তখন ভিতরে যেয়ে খড়ের মানুষটাকে মাটিতে শুইয়ে রেখে বলল এবার এসো।

ছাদে উঠতে হবে, সব সিঁড়ি একে একে পার হয়ে যেতে হবে। সিঁড়ি আর ছাদ একই জিনিষে তৈরি। যিনি আত্মা তিনিই পঞ্চভূত। ব্রহ্ম থেকে জীবে। সা রে গা মা পা ধা নি' র মত। নিতে দাঁড়িয়ে থাকবে না আবার সা'তে নেমে আসবে।

ব্রহ্মের স্বরূপ কি?

ব্রহ্ম প্রদীপ। প্রদীপের সামনে কেউ ভাগবৎ পড়ে, কেউ বা দলিল জাল করে।

প্রদাপ নির্লিপ্ত থাকে।

একবার যমুনা পার হবেন ব্যাসদেব। দধি-দুধের ভাঁড় নিয়ে গোপীরাও দাঁড়িয়ে আছে। তারাও পার হবে, কিন্তু নৌকা নাই।

দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ব্যাসদেবের ভীষণ খিদে পেয়েছে। গোপীরা তাঁকে দুধ দই খাওয়াল। খেতে খেতে ভাঁড় উজাড় হয়ে গেল। তবু নৌকার দেখা নাই।

ব্যাসদেব বললেন যমুনা আমি যদি কিছু না খেয়ে থাকি তবে তুমি ভাগ হয়ে যাও। আমাকে ওপারে যাবার রাস্তা দাও।

যমুনা দুভাগ হয়ে গেল।

আমি খাইনি মানে আত্মা আবার খাবে কি! তার ক্ষুধা, তৃষ্ণা জন্ম, মৃত্যু নাই।

ব্রহ্ম যেমন পেঁয়াজের খোসা। লাল সাদা কত রকম খোসা ছাড়াবে। তারপর ছাড়াতে ছাড়াতে দেখবে কিছু নাই।

নারকেলের জল শুকিয়ে শাঁস আর খোলা আলাদা হয়ে যায়। আত্মাটি দেহের ভিতরে আছে, কাঁচা বাদাম বা সুপুরির মত লেগে আছে। পাকা অবস্থায় শাঁস আর জল আলাদা হয়ে যায়। পাকা অবস্থায় রস শুকিয়ে যায়। ব্রহ্মজ্ঞানও তেমন বিষয় রস শুখিয়ে দেয়।

ব্রহ্মতো নির্লিপ্ত, তবে কাজ করছে কে? চালাচ্ছে কে? চালাচ্ছে শক্তি। নিত্য আর লীলা। পুরুষ আর প্রকৃতি।

প্রকৃতির সাধ্য নাই পুরুষ ছাড়া চলে, পুরুষের সাধ্য নাই প্রকৃতি ছাড়া চলা।

তবে পুরুষ হচ্ছে অকর্তা, প্রকৃতির কাজ দেখছে।

কর্তা আলবোলা টানছেন আর ঘাড় নেড়ে হুঁ হাঁ করছেন। গিন্নি কিন্তু কাপড়ে হলুদ মেখে বাড়িময় ছুটাছুটি করছে। মাঝে মাঝে কর্তার কাছে এসে বলে যাচ্ছে, এটা ভাল হয়নি, ওটা করা হয়নি। কর্তা তামাক টানতে টানতে ঘাড় নেড়ে হুঁ হাঁ করে সাড়া দিয়ে কাজ সারছেন।

ব্রহ্ম আর শক্তি, নিত্য আর লীলা এক।

এক রাজা এক যোগীর কাছে এক কথায় জানতে চেয়েছিল। একদিন এক যাদুকর এসে বলল, এই দেখ। রাজা দেখল যাদুকর দুটো আঙ্গুল ঘোরাচ্ছে। খানিক পরে আঙ্গুল দুটো একটা হয়ে গেল। সেই একটা আঙ্গুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবার দুটি আঙ্গুল করে দেখাল।

রাজার জ্ঞান হল। এক কথায় জ্ঞান মানে একের জ্ঞান। এক জানার নাম জ্ঞান, বহু জানার নাম অজ্ঞান।

শক্তির নাম মহামায়া। ব্রহ্মের চেয়ে মহামায়ার শক্তি বেশী। জজের চেয়ে পেয়াদার শক্তি বেশী। পেয়াদা পরোয়ানা জারি করে আসামী আনলে তবে তো মামলার বিচার।

জগৎসংসার মুগ্ধ করে রেখেছে মহামায়া। খেলা করে সৃষ্টি সংহার খেলা। যে জ্ঞানী সে মহামায়ার আবরণ সরিয়ে দেয়। যে ভক্ত যে স্তব করে। যেন পানা ঢাকা পুকুর। ঢিল মারা পানা সরে গিয়ে একটু জল দেখতে পাবে। আবার পানা এসে জলটুকু চেপে দেবে। বাঁশ দিয়ে পানা ঠেলে সরিয়ে বেঁধে রাখ, পানা আর ঢাকতে পারবে না।

মায়াকে জ্ঞান ভক্তির বেড়া দিয়ে ঠেলে দিলে মায়া আর ভিতরে আসতে পারে না।

যে জ্ঞানী সেই বীর। মায়াকে সে চিনতে পাবে। আর চেনা হলে মায়া পালিয়ে যায়।

এক গুরু শিষ্যবাড়ী যাচ্ছে, সঙ্গে নিয়েছিল এক চাকর। চাকর জাতে মুচি। তাকে বলে দিয়েছে, তুই কথা বলবি না।

সন্ধ্যের সময় শিষ্যবাড়ীতে গুরু সন্ধ্যায় বসেছে, মুচি চাকর বসে আছে দরজায়। আর একজন ব্রাহ্মণ এসে চাকরকে দেখতে পেয়ে বলল, ওরে আমার জুতো জোড়া এনে দে।

চাকর চুপ করে আছে।

ব্রাহ্মণ বারবার বলে, কিন্তু চাকর উত্তর দেয় না।

ব্রাহ্মণ রেগে ধমক দিল, কিরে ব্যাটা কথা কইছিস না যে, তুই কি মুচি?

চাকর ভয় পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে গুরুর দিকে তাকিয়ে বলল, মশাই গো বামুন আমায় চিনে ফেলেছে, আমি পালালাম।

মায়া পালিয়ে গেল। গুরু তাকে প্রশ্রয় দিয়ে রেখেছিল। জ্ঞান এসে তাড়িয়ে দিল।

কিন্তু মায়া কি সহজে যায়?

এক রাজপুত্র পূর্বজন্মে ধোপার ছেলে ছিল। একদিন খেলতে খেলতে সঙ্গীদের বলল, আয় অন্য খেলা খেলি। আমি ধোপার পাট হয়ে শুয়ে পড়ি তোরা হুস হুস করে কাপড় কাচবি।

ঈশ্বরের চেহারাটি কেমন ? সাকার না নিরাকার ?

দু'রকমই হয়েই তিনি আছেন। জ্ঞানীর কাছে নিরাকার, ভক্তের কাছে সাকার।

যেমন বরফ আর জল। জল জমলেই বরফ, গললেই জল। জলের রূপ নাই, বরফের আকার আছে। তেমনি সচ্চিদানন্দ হচ্ছেন অনন্ত সাগরের মত। ভক্তির হিম লেগে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সাগরে মূর্তির বিকাশ হয়। জ্ঞানীর কাছে তিনি যেমন অব্যক্ত ভক্তের কাছে তেমন ব্যক্ত। আবার জ্ঞান-সূর্য উঠলে বরফ গলে আগের মত জল।

ঈশ্বর সত্যি কি রকম, ঈশ্বরের কাছ থেকে জেনে নিলেই তো হয়। যে পাড়াতেই গেল না, জানবে কি করে সে পাড়া কেমন ? কলকাতায় না গেলে বুঝবে কি করে গড়ের মাঠ কোথায় ? খড়দার বামুন পাড়ায় যেতে হলে আগে খড়দায় যেতে হবে।

ঈশ্বর নিরাকার—আবার সাকারও।

একডেলে গাছও আছে আবার পাঁচডেলে গাছও আছে।

রশুন চৌকিতে দু'জনে বাঁশী বাজায়। একজন সানাই বাজায় আর একজন পোঁ ধরে। পোঁটি নিরাকার আর সানাইটি সাকার।

কি করে সাকার থেকে নিরাকারে আসব ?

মূর্তি থেকে চলে আসব বোধে। মনে করো দশভুজা ভগবতীর মূর্তি। তারপর দশভুজা থেকে ষড়ভুজা জগদ্ধাত্রী। ষড়ভুজা থেকে চতুর্ভুজা কালী। চতুর্ভুজা কালী কমিয়ে আন দ্বিভুজ কৃষ্ণে। কৃষ্ণকে আন বাল গোপালে। বাল গোপাল কমিয়ে আন শিবলিঙ্গে। শিবলিঙ্গ থেকে শালগ্রাম শিলায়।

তারপর ?

তারপর আর প্রতীক নাই। আছে অখণ্ড জ্যোতি। সাকার থেকে চলে গেলাম নিরাকার।

এইখানেই লীন হয়ে রইলাম না। আবার চোখ খুললাম। এবার দেখলাম সব কিছুতে ভগবানের প্রতিমূর্তি ? নিরাকার থেকে

আবার এলাম সাকারে। নিরাকারে ছিল সম চেতনা, এবার হলো সমদৃষ্টি।

ব্রহ্ম হচ্ছে সত্তা, প্রকৃতি শক্তি। ব্রহ্ম মন, শক্তি, ইচ্ছা ; ইচ্ছার নাম মায়া। কোথাও কিছু নাই, ধুমধাড়াক্কা আরম্ভ হলো। বেশ রোদ ছিল, চারদিক অন্ধকার হয়ে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হলো, আবার তখনি সব কেটে গিয়ে রোদ উঠল। এর নাম মায়া।

রামকৃষ্ণের যেমন উদার বোধ, তেমনি উদার বুদ্ধি! তিনি বলেন, যত মত তত পথ।

রাখালেরা মাঠে গরু চরাতে নিয়ে যায়। সব গরুই মাঠে গিয়ে এক হয়ে যায়। আবার সন্ধ্যায় নিজের নিজের বাড়ি ফিরে আসে।

কে বুঝবে এই ঈশ্বরের লীলা? যদি জানতে চাও যদি বুঝতে চাও তাকেই জিজ্ঞাসা করো।

ঠকুর বলেন,—তাঁর খুশি।

যতক্ষণ ঈশ্বর লাভ না হয় ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ সংসারে আসতে হবে তারপর আর আসতে হবে না।

যাকে দেখা যায় না তারই জন্য বিরহ। যাকে স্পর্শ করা যায় না সেই আবার সব জুড়ে আছে।

সমুদ্র দিয়ে একটা জাহাজ যাচ্ছে। একটা পাখি এসে মাস্তুলের উপর বসল। চারিদিকে কুলকিনারা নাই দেখে ভয় পেল। ডাঙ্গায় ফিরে যাবার জন্য উড়ে গেল। যাবে কোথায়, কোথাও কিনারা দেখা যায় না। ফিরে এসে আবার মাস্তুলের উপরে বসে পড়ল। ভাবে এই মাস্তুলই আমার স্থির আশ্রয়।

সংসার সমুদ্রের সবদিক ঘুরে এসে বৈরাগ্যের একাসনে নিশ্চিত আশ্রয় নাও।

রামকৃষ্ণ বলেছেন, সংসার যেন বিশালাক্ষীর দ'। দহে একবার নৌকো পড়লে আর রক্ষা নাই। তবুও মানুষ যায়।

পাড়া গাঁয়ে মাছ ধরবার জন্য বিলের ধারে বা মাঠে ঘুনি পেতে

রাখে। ঘুনির মধ্যে জল চিক্ চিক্ করে, ছোট ছোট মাছগুলি ঘুনির মধ্যে সুখের আশায় ঢুকে পড়ে। যে পথে ঢুকেছে সে পথে ইচ্ছে করলে বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু আসে না সংসারের চাকচিক্য এমনি।

সংসারে হচ্ছে আমড়া
আঁটি আর চামড়া।

এক সাধু একটি কুঁড়ে বেঁধে সাধন ভজন করত। সম্বলের মধ্যে একটি কৌপীন আর একটি কাপড়। ইঁদুর এসে কৌপীন কেটে দেয়। সাধু ইঁদুর তাড়াবার জন্য বেড়াল পুষল। কিন্তু বিড়াল খাবে কি? কতদিন আর লোকে দুধ ভিক্ষা দেবে? সাধু একটা গরু কিনলেন। গরুর খড় লাগে। কতদিন আর লোকে খড় দেবে? সাধু বাড়ির কাছে পোড়ো জমিতে চাষ আরম্ভ করল। মস্ত গোলাবাড়ী তৈরী হলো। একদিন সাধুর গুরু এসে সব দেখে শুনে অবাক। বলল, এ সব কি?

সাধু লজ্জিত হয়ে উত্তর দিল,—গুরুজি সব এক কৌপীনকো ওয়াস্তে। এমনি করেই একটার পরে একটা সংসারের ফাঁস আমাদের গলায় জড়িয়ে পড়ে।

সরষের থলি ছিঁড়ে সরষে পড়লে তা কুড়ানো যায় না। কিন্তু উপায় কি? যখন সংসারে থাকতে হবে, তখন থাকব কি ভাবে! কচ্ছপের মত। কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়, মন পড়ে থাকে আড়ায় ডিমের কাছে।

ঝি চাকরি করছে মনিবের বাড়ি। মনিবের বাড়িকেই আমার বাড়ি বলছে। মনিবের ছেলেকে মানুষ করেছে বলেই আমার ছেলে, আমার হরি। কিন্তু মন পড়ে আছে দেশের বাড়িতে। সেখানে ওর নিজের ছেলে আছে।

বিদেশ ভ্রমণে গেলাম। মন কিন্তু আছে কবে বাড়ি ফিরব সেদিকে তাকিয়ে।

মানুষ কে?

রামকৃষ্ণ বলেন মান হুঁস, মানুষ। যার মান সম্বন্ধে হুঁস আছে সেই মানুষ।

কিসের মান? আমি অমুক আমি তমুক এ মান নয়, মান আমি অমৃতের ছেলে।

রামকৃষ্ণ বলতেন, রাজার ব্যাটাহ' মাসোহারা পাবি।

একটি ছোকরা সন্ন্যাসী গৃহস্থবাড়ি ভিক্ষে করতে এসেছে। আজন্ম সন্ন্যাসী, সংসারের সম্বন্ধে একেবারেই কিছুই জানেন না। গৃহস্থের একটি যুবতী মেয়ে এসে তাকে ভিক্ষে দিল। সন্ন্যাসী বলল, মা, এর বুকে কি ফোঁড়া হয়েছে? মেয়েটির মা বলল, না বাবা, ওর ছেলে হবে ঈশ্বর তাই স্তন দিয়েছেন। স্তনের দুধ খেয়ে ছেলে বাঁচবে। সন্ন্যাসী তখন বলল, তবে আমি আর ভিক্ষে করব কেন? ঈশ্বর আমাকে খেতে দেবেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই আহার দেবেন।

কাঠে আগুন আছে বললে তো আর ভাত রান্না হবে না। কাঠের মধ্যে নিহিত আগুনকে নিষ্কাশিত না করলে রান্না হবে কি করে? মাটির নিচে জল আছে জানি কিন্তু তাতেই কি আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ হয়?

কোনো পুকুরে মাছ ধরতে হলে কি কর? যারা সে পুকুরে মাছ ধরছে তাদের কাছে খোঁজ নাও। কি মাছ আছে, কি টোপ খায় এসব জেনে নাও। তারপর ছিপ ফেলা মাত্রই মাছ ধরা পড়ে, না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা কর। তারপর মাছ ঘাই দেয়—ফুট ছাড়ে তখন তোমার বিশ্বাস হয় পুকুরে মাছ আছে, মাছ ধরা যাবে।

এই সৃষ্টি হচ্ছে পুকুর, ঈশ্বর হচ্ছেন মাছ। যাদের থেকে খোঁজ নাও তারা হচ্ছেন গুরু। মন ছিপ, প্রাণ কাঁটা, নাম টোপ। আর ঘাই আর ফুট হচ্ছে ঈশ্বরের ভাবরূপ।

চারদিক অন্ধকার করে বৃষ্টি হচ্ছে। নদী পার হয়ে গয়লানী

যাবে পণ্ডিতের বাড়ি দুধ দিতে, কি করে যায়। বুড়ি ভাবল, রাম নামে ভব সাগর পার হওয়া যায়, আমি এই ছোট নদীটা পার হতে পারব না? রাম রাম বলে বুড়ি নদী পার হয়ে গেল। পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করল, কি করে এলি বুড়ি? বুড়ি বলল খুব সহজে রাম নাম বলে। পণ্ডিত বলল, তাহলে আমিও পারব? কেন পারব না, নিশ্চয় পারব। ফিরতি পথে বুড়ির সঙ্গে পণ্ডিতও এলো।

বুড়িতো রাম রাম বলে দিব্যি পার হয়ে গেল। জলে নেমে পণ্ডিত রাম রাম বলে আর কাপড় গুটায়। বুড়ি পিছন ফিরে দেখে বলল, বাবা ঠাকুর বাম নাম করবে আবার কাপড়ও গুটাবে, তা হবে না।

বিশ্বাস যত অন্ধ হয় তার জোর তত বেশী হয়।

রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ লঙ্কায় গেলেন তিনি সেতু পার হয়ে। কিন্তু হনুমান গেল রাম নাম করে একলাফে।

পাথর হাজার বছর জলে পড়ে থাকলেও তাব মধ্যে জল ঢোকে না। কিন্তু মাটিতে জল লাগলে তখুনি গলে যায়। যারা বিশ্বাসী হাজার বিপদেও তারা হতাশ হয় না। কিন্তু অবিশ্বাসীর মন সামান্য কারণে টলে যায়। যে গরু বাচ-কোচ করে খায়—সে ছিড়িক ছিড়িক করে দুধ দেয়। আব যে গরু গব-গব করে খায়—সে হুড় হুড় করে দুধ দেয়।

যে পরম আনন্দটির আমরা সন্ধান করি সে আনন্দটি কোথায় পাব? সে আনন্দটি আমাদের মধ্যেই আছে।

হরিণের নাভিতে কস্তুরী থাকে, তা হরিণ জানেনা। গন্ধে দশদিক আমোদ হচ্ছে দেখে ছুটে বেড়ায়। অথচ একথা কে তাকে বলে দেবে?

হরিণের মত উদভ্রান্ত হয়ে ছুটছি আমরা। আনন্দের বাসা যে আদের বুকের মধ্যে সে খবর রাখি না।

একজন তামাক খোর অনেক রাতে প্রতিবেশীর ঘরে টীকে ধরাতে

গেল। ডাকাডাকিতে ঘুম থেকে প্রতিবেশী উঠে এলো। তামাক খোর বলল, ভাই একটু টিকে ধরাব তামাক খেতে হবে, তাই তোমাকে জাগিয়েছি।

প্রতিবেশী হাসতে হাসতে বলল,—সেকি তোমার নিজের হাতেই যে লণ্ঠন আছে। ঠাকুর বলতেন, যতক্ষণ বোধ সেথা, ততক্ষণ অজ্ঞান, —যখন হেথা হেথা তখনই জ্ঞান।

মানুষ অষ্ট পাশে বাঁধা। ঘৃণা, লজ্জা, মান, অপমান, মোহ, দম্ভ, দ্বেষ আর পৈশূন্য। গোপীদের বস্ত্রহরণ মানে কি ? গোপীদের সব পাশই গিয়েছিল, শেষপাশ লজ্জা ছিন্ন হলো।

পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব।

তাই কেউ পরীক্ষায় পাশ করে এলে ঠাকুর বলতেন, পাশ করা না ফাশ পরা। রাককৃষ্ণ বললেন,—আজ বাগবাজারের পুল পেরিয়ে এলাম। অনেকগুলি শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে। একটা ছিঁড়লে কিছু হবে না, অন্যগুলি ধরে রাখবে।

সংসারীরও অনেক বন্ধন। একটা যায় তো আর একটা আটকে রাখে। সংসার ছেড়ে গেরুয়া পর, গেরুয়ায় অহঙ্কার জুটবে।

অহঙ্কার কিছুতেই যায় না।

অশ্বত্থ গাছ কেটে দাও দেখবে আবার শিকড় বেরিয়ে যাবে।

একটা কিছু করবার শক্তি হলেই অহঙ্কারটি মাথা উঁচু করে উঠবে।

ঠাকুর বলতেন, ছুঁচের ভিতরে স্নতো যাওয়া, একটু রোঁ থাকলে আর হবে না।

আমি,—

এই আমিটাই বড়। আমির মূলচ্ছেদ নাই।

ছাগল কেটে ফেলা হয়েছে তবু নড়ছে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এই যায় এই আসে অহঙ্কার। ছোট একটা তুচ্ছ ছিদ্র হয়েছে টেলিগ্রাফ লাইনে শব্দ আর আসে না।

টেলিগ্রাফ তারে যদি একটু ফুটো থাকে তবে আর শব্দ আসবেনা।

উপায় কি ? ত্রাণ কিসে ?

গুরু শিষ্যকে বললেন,—যাও বনে গিয়ে তপস্যা করে সিদ্ধ হও। শিষ্য বারো বৎসর তপস্যা করল। ফিরে এসে দেখে গুরুর গুহাদ্বার বন্ধ।

দরজায় ধাক্কা দিল শিষ্য। ভিতর থেকে গুরু বললেন, কে ?

আমি।

কণ্ঠস্বরে গুরু বুঝতে পারলেন শিষ্য ফিরে এসেছে। বললেন,—তোমার তপস্যা এখনও শেষ হয়নি। সিদ্ধি এখনো অনেক দূরে। শিষ্য আবার গিয়ে তপস্যা আরম্ভ করল। আবার যখন ফিরে এলো দেখল গুরুর দ্বার রুদ্ধ। আবার করাঘাত করল, এবার মুক্ত হলো গুহাদ্বার। গরু যতক্ষণ হাম্বাহাম্বা করে—মানে হাম্ হাম্ আমি আমি ততক্ষণই তার যন্ত্রণা। তাকে লাঙ্গলে জোড়ে, রোদ বৃষ্টি গায়ের উপর দিয়ে যায়। তারপর কশাই কাটে, চামড়াব জুতো হয়, ঢোল হয়, তখন সেই ঢোল সবাই বাজায়। তবুও নিস্তার নাই, শেষে নাড়ি ভুঁড়ি থেকে তাঁত তৈরী হয়। সেই তাঁতে ধুনুচীর যন্ত্র হয়। তখন আর আমি আমি বলে না, বলে তুঁহু তুঁহু অর্থাৎ তুমি তুমি। যখন তুমি বলে তখন তার নিস্তার। সংসারী আমি, অবিদ্যার আমি একটা মোটা লাঠির মত। কিন্তু ঈশ্বরেব দাস আমি, বালকের আমি, বিদ্যার আমি, এ হচ্ছে জলের উপরে রেখার মত।

আবার সংশয় থেকেই সংসারীর সন্দেহ, তিনি কি আছেন ? বেশ তো, তাহলে, প্রমাণ কই প্রমাণ দাও।

কিন্তু একদিনেই কি নাড়ি দেখা শিখতে পারা যায় ? বৈদ্যের সঙ্গে অনেক দিন ঘুরতে হয়। তখন কোনটা কফের কোনটা বায়ুর, কোনটা পিত্তের নাড়ি বলতে পারা যায়। যাদের নাড়ি দেখা ব্যবসা তাদের সঙ্গে থাকতে হয়। তবে তো নাড়িজ্ঞান হবে।

অমুক নম্বরের সুতো যে সে কি চিনতে পারে ? সুতোর ব্যবসা করো—যারা ব্যবসা করে তাদের সঙ্গে কিছুদিন থাকো তবে কোনটা

চল্লিশ নম্বর, কোনটা একচল্লিশ ঝাঁ করে বলতে পারবে।

সংসারী লোক সব স্ত্রীর দাস।

ঠাকুর বলতেন, যতসব দেখিস তোমরা বাবু ভায়া, কেউ জজ, কেউ মেজেষ্টর, বাইরে যত বোল্‌-বোলাও, স্ত্রীর কাছে কেঁচো। অন্দর থেকে কোন হুকুম এলে অন্যায় হলেও সেটা রোদ করবার কারু ক্ষমতা নাই। ভালই হোক, মন্দই হোক নিজের পরিবারকে সকলেই সুখ্যাত করে।

একজন একটি কাজের জন্য অফিসের বড়বাবুর কাছে যেতে যেতে হয়রান হল। বড়বাবু বললেন, এখন খালি নাই মাসে মাসে এসে দেখা করে যেয়ো। অনেক দিন হয়ে গেল, কিছুই হলো না। তার বন্ধু একথা জানতে পেরে বলল, তোমার যেমন বুদ্ধি। বড়বাবুর কাছে গেলে এজন্মেও কিছু হবে না। তুই এক কাজ কর। গোলাপীকে ধর, কাজ হবে। গোলাপীর কাছে এসে লোকটি বলল, মা আমি মহাবিপদে পড়েছি। কাজকর্ম নাই, ছেলেপিলে নিয়ে না খেয়ে মারা যেতে বসেছি। ব্রাহ্মণের ছেলে আমি, আপনি একটু বলে দিলেই আমার কাজ হয়।

গোলাপী বলল, কোন বাবুকে বলতে হবে বাছা, বলে যাও। লোকটি বলল, বড়বাবুকে একটু বলে দিন।

পরদিন সকালেই সেই লোকটির কাছে খবর এলো, সেদিন থেকেই বড়বাবুর সঙ্গে যেতে হবে। সাহেবকে বড়বাবু বোঝালেন এ অতি উপযুক্ত লোক, একে দিয়ে অফিসের উপকার হবে। একে তাই বহাল করছি।

সংসারে দু'রকম স্বভাবের লোক আছে।

কতগুলো লোকের স্বভাব হয় কুলো, কারু স্বভাব চালুনি। কুলো অসারবস্তু ত্যাগ করে সারবস্তু গ্রহণ করে। চালুনি সারবস্তুগুলি ত্যাগ করে অসার বস্তুগুলি নিজের মধ্যে রেখে দেয়।

সংসারে সঙও আছে সারও আছে, তাই নাম হলো সংসার।

সং হচ্ছে মায়া, সার হচ্ছে ভগবান।

ঠাকুর মানুষকে দুভাগ করে বলতেন একভাগ মাটির দেওয়াল, একভাগ পাথরের দেওয়াল। মাটির দেওয়ালে পেরেক পুঁততে কষ্ট হয় না। পাথরের দেওয়ালে পেরেকের মাথা ভেঙ্গে যায়, তবু কিছু হয় না।

তরোয়ালের চোটে কুমীরের কিছুই হয় না। তরোয়াল ঠিকরে পড়ে। তেমনি বদ্ধজীবের কাছে যত ধর্মের কথা বল, কিছুই তার প্রাণে লাগে না।

হাতীর দাঁত বাইরেও আছে, ভিতরেও আছে। বাইরে দাঁত শোভা—ভিতরের দাঁত দিয়ে খায়।

মন মত্ত করী। হাতীর স্বভাব নাইয়ে দিলেও গায়ে কাদা মাখে। কিন্তু মাহুত যদি তাকে হাতীশালে ঢুকিয়ে দেয়, তখন আর গায়ে কাদা মাখতে পারে না।

মাহুত যেমন হাতীকে রাখে, গুরুও তেমন মানুষকে রাখে। একবার ঈশ্বর সত্তায় স্নান করিয়ে যদি রাখতে পারে, তবে আর ভয় নাই।

একটা ছাগলের পালে বাঘিনী পড়েছিল। দূর থেকে একটা শিকারী তাকে মেরে ফেলল। অমনি তার প্রসব হয়ে একটা ছানা হ'ল। ছানাটি ছাগলের পালের সঙ্গে বড় হতে লাগল। ছাগলেরাও ঘাস খায় বাঘের ছানাও ঘাস খায়। তারাও ভ্যা ভ্যা করে, সেও ভ্যা ভ্যা করে। ক্রমে ছানাটা বড় হলো। একদিন ঐ ছাগলের পালে আর একটা বাঘ এসে উপস্থিত। বাঘ তখন ঘাস খেকো বাঘের বাচ্চাটাকে ধরে ফেলল। বাচ্চা ভয়ে ভ্যা ভ্যা করতে লাগল। বাঘ তখন তাকে টেনে হিচড়ে জলের কাছে নিয়ে এলো। বলল, এই জলের ভিতরে তোর মুখ ছাখ, আমারও যেমন হাঁড়ির মত মুখ, তোরও তেমন হাঁড়ির মত মুখ। এই নে খানিকটা মাংস খা। বলে খানিকটা মাংস মুখের মধ্যে গুঁজে দিল। প্রথমটা

কিছুতেই খাবে না। তারপর একটু একটু করে খেতে লাগল। বাঃ বেশ তো খেতে। বড় বাঘটা বলল, এবার বুঝেছিস, তুইও যা আমিও তা। এখন আমার সঙ্গে বনে চল।

ছাগলের পালে বাঘের ছানা যেমন আত্মবিস্মৃত অমৃতপুত্র। ঘাস খাওয়া মানে কামিনী কাঞ্চন নিয়ে থাকা। ছাগলের মত পালান মানে বদ্ধ জীবের মত ব্যবহার করা। বাঘের আক্রমণ হচ্ছে গুরুলাভ। রক্তের স্বাদ মানে হরিনামের স্বাদ। বনে চলে যাওয়া মানে চৈতন্য-দাতা গুরুর শরণ নেয়া।

রামকৃষ্ণ বলেছেন,—গেরুয়া অহমিকা।

সংসারে এসেছ সংসারেই থাক।

যদি কেরাণিকে জেলে দেয় সে জেল খাটে। কিন্তু যখন তাকে ছেড়ে দেয় তখন সে কি করে? আগের মতই আর একটা কাজ জুটিয়ে নিয়ে কাজ করে খায়।

হৃদয়ে জ্বেলে রাখার একটি মাত্র আলো। ওইটি হবে জ্ঞানচক্ষু। কিন্তু সদ্‌গুরু ধরা চাই। গুরু কাঁচা হলে গুরুরও যন্ত্রণা শিষ্যেরও যন্ত্রণা।

শুনতে পেলাম একটা কোলা ব্যাঙ খুব ডাকছে। বোধ হয় সাপে ধরেছে। অনেকক্ষণ পরে যখন ফিরে আসছি শুনলাম তখনও ডাকছে। কি হয়েছে, একবার উঁকি মেরে দেখলাম। দেখি একটি ঢোঁড়ায় ব্যাঙ ধরেছে, ছাড়তেও পারছে না গিলতেও পারছে না। তখন ভাবলুম যদি ওকে জাতসাপে ধরত তিন ডাকের পরে ও চুপ হয়ে যেত। ঢোঁড়ায় ধরেছে, ব্যাঙটারও যন্ত্রণা সাপেরও যন্ত্রণা।

ঠাকুর বলেছেন, যুদ্ধ যখন করতেই হবে, তখন কেল্লায় থেকেই যুদ্ধ করা ভাল। মাঠে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার অনেক বিপদ, অনেক অসুবিধা। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে, ক্ষুধা-তৃষ্ণার সঙ্গে, বাসনার সঙ্গে যুদ্ধ করা গৃহে থেকেই ভাল। যদি খেতে না পাও ঈশ্বর টিশ্বর সব ঘুচে যাবে।

রামকৃষ্ণ বললেন, এক হাতে কর্ম কর আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে রাখ। কর্ম শেষ হলে তখন ঈশ্বরকে দুহাতে ধরবে।

অন্তরে সোনা আছে, একটু মাটি চাপা। একবার যদি সন্ধান পাও অন্য কাজ সব মাথায় উঠবে। কেবল খুঁড়বে।

আত্মীয় কালসাপ, ঘর পাতকুয়ো। বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বুঝলে, ঈশ্বর ছাড়া এরা সব ধাপ্পাবাজি। সব আমার আমার করছি, কিন্তু সব বোকা, ভানুমতীর খেলা, নিজেকে ভালোবাসার নাম মায়া, পরকে ভালবাসার নাম দয়া।

বড় মানুষের বাগান যদি কেউ দেখতে আসে, বাগানের সরকার বলে, আমাদের বাগান। কিন্তু মনিব যদি তাড়িয়ে দেয়, তখন সেখান থেকে একটি কুটো পর্যন্তও নিয়ে যেতে পারে না।

গুরু শিষ্যকে বলল, সংসার মিথ্যা। তুই আমার সঙ্গে চলে আয়। ঈশ্বরই তোর আপন, আর কেউ তোর আপন নয়। শিষ্য বলল, সে কি কথা। আমার মা, বাবা, ভাই-বোন, আমার স্ত্রী, এদের ছেড়ে কেমন করে যাব? গুরু বলল, ওসব তোর মনের ভুল। তোকে একটা বড়ি দিচ্ছি, তুই খেয়ে শুয়ে থাক। লোকে মনে করবে, তুই মরে গেছিস। আসলে তুই সব দেখতে শুনতে পাবি। বাড়ি এসে শিষ্য বড়ি খেয়ে মড়ার মত পড়ে রইল। কান্নাকাটি পড়ে গেল। কবিরাজ বেশে গুরু এসে উপস্থিত। সব শুনে বলল, এর ওষুধ আছে। রুগিকে বাঁচিয়ে দেব। কিন্তু একটা কথা, আগে একজনকে সে ওষুধ খেতে হবে। যিনি খাবেন তিনি অক্কা পাবেন। যদি তা হয় তবে ছেলেটিকে বাঁচাতে পারি।

শিষ্য সব শুনছে। কবিরাজ আগে মাকে ডাকল। মা বলল, ওর যা হবার তাতো হয়েছে, কিন্তু আমি গেলে এ বৃহৎ সংসার কে দেখবে?

স্ত্রী এতক্ষণ কাঁদছিল, কবিরাজ তাকে ডাকল।

স্ত্রী বলল, ওর যা হবার হয়ে গেছে। আমি গেলে বাচ্চাগুলো যে ভেসে যাবে।

শিষ্যের তখন বড়ির নেশা ছুটে গেছে। সে তখন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, গুরুদেব চলুন।

একবার দেশে অনাবৃষ্টি হয়। কিন্তু চাষারা চাষ দিতে থেমে থাকেনি। জল না হলে আর কি করা যাবে, খাল বিল থেকে জল আনবার চেষ্টা করতে হবে। সবাই রোজ রোজ একটু একটু করে খাটে। এক চাষী ভাবল আজই খালে নদীতে যোগ করে দেব। যদি কাল মরে যাই তবে তো ছেলেরা না খেয়ে মরবে। এই ভেবে এক নাগাড়ে সে কেটে চলল। এদিকে অনেক বেলা হলো দেখে গিন্নি মেয়েকে দিয়ে তেল গামছা মাঠে পাঠিয়ে দিয়ে চাষীকে নেয়ে নিতে বলল। চাষীর কাছে ধমক খেয়ে মেয়ে পালিয়ে এলো। বেলা আরো বাড়তে দেখে চাষী-গিন্নি নিজেই গেল। চাষী কোদাল নিয়ে স্ত্রীকে তাড়া করল। স্ত্রী পালিয়ে এলো। চাষী আবার মাটি কাটতে লাগল। কোনদিকে তার হুঁস নাই। সারাদিনের পরিশ্রমের পরে নদীর সঙ্গে খানার যোগ করে দিয়ে বাড়ি এসে বলল, দে, তেল দে, আর একটু তামাক সাজ। তারপর নেয়ে খেয়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোতে লাগল।

সময় না এলে কিছু হবার নয়।

কার যে কি করে সময় আসবে কেউ বলতে পারে না।

কিন্তু সেই সময়টি আসা চাই।

একদিন কেশব সেন এসেছিল। রাত দশটা পর্যন্ত ছিল। কেউ কেউ বলল, আজ থেকে যাও। কেশব বলল, না কাজ আছে।

রামকৃষ্ণ হেসে বললেন, কেন গো আঁশ চুপড়ির গন্ধ না হলে কি ঘুম হবে না।

একজন মেছুনী মালীর বাড়িতে অতিথি হয়েছিল। মাছ বিক্রি করে ফিরছে। চুপড়ি আছে সঙ্গে। মেছুনীকে দেওয়া হলো ফুলের ঘরে শুতে। অনেক রাত পর্যন্ত মেছুনির ঘুম হলো না। বাড়ির গিন্নি বলল, কি গো ছটফট করছ কেন? মেছুনী বলল, কি জানি

বাপু, বোধ হয় ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না। আমার আঁশ চুপড়িটা আনিয়ে দিতে পার। আঁশ চুপড়ি মাথার কাছে নিয়ে মেছুনি ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোতে লাগল। আঁশ চুপড়ি হচ্ছে কাম কাঞ্চনের সংসার। পুষ্পবাস সাধু সঙ্গ।

গাঁজাখোরকে দেখে গাঁজাখোরের যেমন আনন্দ, ভক্তকে দেখে ভক্তের সে রকম আনন্দ।

কেশব সেন বললেন, আপনার কাছে এত লোক আসে কেন? কুটুস করে কামড়ে দেবেন। তখন পালিয়ে যাবে।

কুটুস করে কামড়াব কেন? আমি তো লোককে বলি এও কর ওও কর।

সংসারও কর, ঈশ্বরকেও ডাক।

সংসারীদের দেখে রামকৃষ্ণ বলেছেন। এ এক রকম বেশ। সারও আছে মাটিও আছে। আমি বেশী কাটিয়ে জ্বলে গেছি।

রামকৃষ্ণ বলতেন, তোমাদের সব আঠারো মাসে বছর।

ভক্তদের স্বভাব হচ্ছে গাঁজাখোরের মত। গাঁজাখোরের যেমন কলকে সাজিয়ে, ভরপুর দম লাগিয়ে, অন্যের হাতে দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে থাকে, অন্য গাঁজাখোর না নিলে যেমন সুখ হয় না, ভক্তরাও তেমন একসঙ্গে জুটলে, একজন ভাবে তন্ময় হয়ে ভগবানের কথা বলে, চুপ করে অন্যকে আবার সে কথা বলবার সুযোগ দিয়ে, শুনে আনন্দ পায়।

ভক্তি যদি একবার ধরে, তবে আনন্দরসে মাতাল করে রাখে।

গিরিশ ঘোষকে ঠাকুর বলেছিলেন, তুই মদের নেশা করেছিস কারণ তুই এখনও আর এক নেশার খবর পাস্‌নি।

ছেলে বলেছিল, বাবা একটু মদ চেঁখে দেখ। তারপর আমায় ছাড়তে বলো।

বাবা খেয়ে বললেন, তুমি বাছা ছাড়ো আমার আপত্তি নাই কিন্তু আমাকে ছাড়তে বলো না।

বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।

## চতুর্থ স্তবক

মানিকরাম চাটুজ্জে থাকেন দেবগ্রামে। গ্রামের জমিদার রামানন্দ রায়। প্রবল প্রতাপ জমিদার। অত্যাচারে তুলনাহীন।

মানিকরামের ঘরে আছেন রঘুবীর, মানিকরামের উপাস্য দেবতা।

ক্ষুদিরাম চাটুজ্জে মানিকবামের বড় ছেলে।

বিষয় সম্পত্তি দেখেন আর রঘুবীরের সেবা করেন।

মানিকরাম মারা গেলে ক্ষুদিরামই হলেন বাড়ির কর্তা। ধার্মিক লোক বলে সুনাম আছে।

ক্ষুদিরামের দু'বিয়ে। প্রথম পক্ষের স্ত্রী অল্প বয়সেই মারা যান। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী চন্দ্রমণি বাড়ির গিন্নি।

গ্রামের জমিদার ডেকে পাঠাল—মিথ্যা সাক্ষী দিতে হবে।

ক্ষুদিরাম রাজি হলেন না।

জমিদার মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে ক্ষুদিরামকে ভিটে থেকে উচ্ছেদ করলেন।

রঘুবীরকে বুকে নিয়ে, স্ত্রী পুত্রের হাত ধরে ক্ষুদিরাম কামারপুকুরে চলে এলেন।

কামারপুকুরের সুখলাল গোস্বামী একবিঘা জমি দিলেন। ক্ষুদিরাম আবার ঘর বাঁধলেন।

একদিন দুপুরবেলা ক্ষুদিরাম ফিরছেন ভিন্‌গাঁ থেকে। একটু বিশ্রাম করবার জন্য একটা গাছের নিচে বসলেন। গাছের ছায়ায় তন্দ্রার ঘোর এলো। স্বপ্ন দেখলেন ক্ষুদিরাম, শ্রীরাম বালক বেশে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখখানি ম্লান।

আমি বড় অযত্নে আছি, আমাকে তোর বাড়িতে নিয়ে চল। অনেকদিন কিছু খাইনি।

কিন্তু ঠাকুর! ক্ষুদিরাম আকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন, আমি তোমাকে কি খাওয়াব? তোমাকে ভাল করে সেবা করবার সাধ্য যে আমার নেই।

তুই আমাকে নিয়ে চল্। রামচন্দ্র বললেন, যার ভক্তি আছে আমি তার কোন ত্রুটি ধরি না।

ঘুম ভেঙ্গে গেল ক্ষুদিরামের। চারপাশে তাকিয়ে দেখেন, কেউ কোথাও নাই। কিন্তু স্বপ্নে যে ধান ক্ষেতটি দেখেছিলেন, ওইতো সেই ধান ক্ষেত।

এগিয়ে গেলেন ক্ষুদিরাম। একটুকরো পাথরের উপরে এক বিষধর সর্প ফণা তুলে আছে। লক্ষ্য করে দেখলেন, পাথরটি সামান্য পাথর নয়—শালগ্রামশীলা।

তাহলে স্বপ্ন মিথ্যা নয়। ঐ শীলাটি হচ্ছেন রামচন্দ্র।

ক্ষুদিরাম শীলাটি তুলে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ মিলিয়ে দেখলেন, শীলাটি 'রঘুবীর' শীলা।

একদিন কামারপুকুর থেকে ক্ষুদিরাম মেদিনীপুর যাচ্ছেন। ত্রিশ চল্লিশ মাইল পথ হেঁটে যেতে হবে। ফাল্গুন মাস। পুরাণ পাতা পড়ে গিয়ে গাছে গাছে নতুন পাতা দেখা দিয়েছে। রাস্তার পাশে এক বেল গাছ নতুন পাতায় ভরে আছে।

ক্ষুদিরাম বেলপাতা তুলে বাড়ি ফিরে এলেন।

ফিরে আসতে দেখে চন্দ্রমণি অবাক।

বললেন,—মেদিনীপুর গেলে না?

এই দেখ, ক্ষুদিরাম উত্তর দিলেন,—কত বেলপাতা। সব নতুন বেলপাতা। আজ প্রাণ ভরে শিবপূজা করব। মেদিনীপুর আর যাবে কোথায়? কিন্তু এরকম বেলপাতা পাবনা।

ক্ষুদিরাম একবার গেলেন সেতুবন্ধ রামেশ্বর, পায়ে হেঁটে ফিরে আসবার সময় নিয়ে এলেন বাণলিঙ্গ শিব।

ক্ষুদিরামের বড়ছেলে রামকুমার বড় হয়ে উঠেছে। যজমান বাড়ির

পূজো অর্চ্চনা আজকাল রামকুমার করে। একদিন রামকুমারের পূজো করে ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে চন্দ্রমণি পথের দিকে তাকিয়ে আছেন। রাত হয়েছে, চাঁদের আলোয় দিনের মত দেখাচ্ছে। চন্দ্রমণি দেখলেন, একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী মেয়ে একগা গয়না পরে এগিয়ে আসছে।

চন্দ্রমণি গায়ে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোত্থেকে আসছ মা ?

মেয়েটি বলল, ভুরসুবো।

ভুরসুবোয় পূজো করতে গেছে রামকুমার।

চন্দ্রমণি বললেন,—আমার ছেলেকে দেখেছ ? বলেই বুঝলেন বলাটা ঠিক হয়নি। ভদ্রঘরের মেয়ে কি করে চিনবে ?

মেয়েটি বলল,—ভয় নেই আপনার ছেলে একটু পরেই আসবে।

চন্দ্রমণি বললেন,—গয়না পরে এত রাতে একা কোথায় যাচ্ছ। আমার বাড়িতে এস রাত কাটিয়ে কাল ভোরে তুমি চলে যেয়ো।

মেয়েটী বলল,—আপনার বাড়িতে পরে আসব মা। আজ থাকতে পারব না। মেয়েটি চলে গেল।

বাড়ির পাশেই লাহাবাবুদের সার বাঁধা ধানের মড়াই। মেয়েটি সে দিকে চলে গেল।

চন্দ্রমণির কাছে সব কথা শুনে ক্ষুদিরাম বললেন,—তুমি শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেবীকে দেখেছ। নিজে মুখে যখন আসবে বলে গেছেন, তখন আসবেন।

মেয়ে কাত্যায়ণীর বিয়ে হয়েছে আনুড়ে। খবর এলো কাত্যায়ণী অসুস্থ। ক্ষুদিরাম মেয়েকে দেখতে আনুড়ে এলেন।

মেয়ের হাবভাব যেন কেমন অস্বাভাবিক মনে হলো।

ক্ষুদিরাম ধ্যানে বসে জানতে পারলেন, মেয়ের উপরে প্রেতযোনি ভর করেছে।

বললেন, আমার মেয়েকে কেন কষ্ট দিচ্ছ ?

প্রেতযোনি উত্তর দিল, চলে যাব, যদি একটা কথা রাখ, গয়ায় আমার পিণ্ড দাও।

বেশ দেব। ক্ষুদিরাম বললেন,—কিন্তু তুমি যে যাবে তার প্রমাণ কি ?

ঐ নিম গাছটার মোটা ডালটা ভেঙ্গে যাব।

নিম গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়ল।

ক্ষুদিরাম গয়া রওনা হলেন। কথা দিয়েছেন প্রেতযোনির পিণ্ডি দেবেন। পিণ্ডিদান করলেন ক্ষুদিরাম। রাত্রিতে স্বপ্ন দেখলেন,—গদাধর এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন। বলছেন, আমি তোমার ছেলে হয়ে জন্মাব।

ক্ষুদিরাম বললেন,—আমি গরীব, তোমার যত্ন আমি কি করে করব ?

ভয় নাই। গদাধর বললেন,—সেবা থেকে ভক্তি বড়। ভক্তিতে আমার তৃপ্তি। এদিকে চন্দ্রমণিরও নানারূপ দর্শন হচ্ছে।

একদিন দেখলেন তাঁর বিছানার পাশেই কে শুয়ে আছে। ধড়মড় করে উঠে বসলেন চন্দ্রমণি। কিন্তু কেউ নাই। ঘরের খিল তেমনি আছে, দরজাটিও তেমনি বন্ধ।

যুগীদের শিবমন্দিরে গেছেন চন্দ্রমণি। মহাদেবের গা থেকে আলোর শিখা বেরিয়ে এসে চন্দ্রমণিকে ছেয়ে ফেলল।

গয়া থেকে ফিরে এসে ক্ষুদিরাম সব শুনলেন।

চন্দ্রমণি বললেন,—কেউ যেন আমার পেটে এসেছে বলে মনে হচ্ছে।

ক্ষুদিরাম বললেন,—গদাধর আছেন।

চন্দ্রমণির নানা দিব্যদর্শন হতে লাগল। কখনো ত্রাসে কেঁপে ওঠেন, কখনো আনন্দে ডগমগ, আবার কখনও উদাসীন। কখনো বলেন, আবার এ গর্ভ পতি স্পর্শে হয়নি, কখন বলেন আমার গর্ভে পুরুষোত্তম আছেন। আবার কখন কেঁদে ওঠেন, আমাকে বুঝি গোঁসাইয়ে পেল। গোঁসাইয়ে পাওয়া মানে ভূতে পাওয়া।

ক্ষুদিরামের বন্ধু সেই সুখলাল গোস্বামী, যে ক্ষুদিরামকে

কামারপুকুরে এনেছিল, সেই গোস্বামী ঠাকুর মারা যাবার পর থেকে নানা উৎপাত দেখা দিয়েছে। সবাই ভাবে এসব গোস্বামীর প্রেতযোনির কাজ। তাই বলে, গোঁসাইয়ে পাওয়া।

ক্ষুদিরাম মনটি খাঁটি রেখেছেন, জানেন চন্দ্রমণির কোলে কে আসছে। একদিন ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছেন চন্দ্রমণি। ঘরের মধ্যে কে যেন নুপূর পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চন্দ্রমণি উঠে বসলেন, চারদিকে তাকালেন, কিন্তু কেউ নাই।

ক্ষুদিরাম শুনে বললেন, গোকুলচন্দ্র আসছেন।

একদিন চন্দ্রমণি গাঢ় চন্দনের গন্ধ পেলেন। মনে হলো বুকের উপরে উঠে, কে এক শিশু গলা জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছে।

১২৪১ সালের ৬ই ফাল্গুন—ইংরেজী ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের সতেরই ফেব্রুয়ারি, শুক্লপক্ষ, ব্রহ্ম মুহূর্তে চন্দ্রমণির কোল আলো করা এক ছেলে হলো।

চন্দ্রমণি শুয়ে আছেন। পাশে আছে ছেলে। ধাই ধনী আছে বসে।

হঠাৎ ধনী চমকে উঠল, একি! ছেলে কই? এইত ছেলে শুয়ে ছিল। তবে? ধনী উঠে দেখে যে ধান সেদ্ধ উনুনের মধ্যে ঢুকে আছে। উনুনে আগুন নাই, আছে ছাইয়ের গাদা। এক গা ছাই মেখে সেই ছাইয়ের গাদায় শুয়ে আছে ছেলে।

একদিন ছেলেকে নিয়ে বসে আছেন চন্দ্রমণি। ছেলে যেন দানবের মত ভার হয়ে উঠল। চন্দ্রমণি তাড়াতাড়ি একটা কুলোর উপরে ছেলেকে শুইয়ে দিলেন। কুলা চড়চড় করে উঠল। চন্দ্রমণি কাঁদতে লাগলেন, নিশ্চয় ছেলের উপরে কিছু ভর করেছে।

ধনী ছুটে এসে সব শুনে বলল, আমি দেখছি।

সংসারের কাজ সেরে পাঁচ মাসের কচি বাচ্চাকে নিয়ে মশারি ফেলে শুয়ে আছেন চন্দ্রমণি। হঠাৎ দেখেন কে একজন বিরাটকায় পুরুষ শুয়ে আছে। চন্দ্রমণি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন।

ক্ষুদিরাম ছুটে এলেন।

—দেখ দেখ বিছানায় কে শুয়ে, কাঁদতে কাঁদতে বললেন চন্দ্রমণি।

ক্ষুদিরাম তাকালেন মশারির দিকে, দিব্যি শুয়ে বাচ্চা ঘুমোচ্ছে। গম্ভীর হলেন ক্ষুদিরাম, বললেন, কাউকে কিছু বলো না।

ছেলের মুখে ভাত হবে। পাড়ার লোক এসে ধরেছে, পাড়া শুদ্ধ নিমন্ত্রণ করতে হবে।

ধর্মদাস লাহা ক্ষুদিরামের বন্ধু। ক্ষুদিরাম এসে বললেন, বন্ধু এখন আমি কি করি বল। পাড়ার লোকদের আশা, কিন্তু আমার যে শক্তির বাইরে! ধর্মদাস মুচকি হেসে বললেন, ভাই ভগবানের নাম করে নেমে পড়, দেখবে আটকাবে না।

ধর্মদাসই সব ব্যবস্থা করলেন। গাঁয়ের লোকদের মাথায় মৎলবটিও তিনিই দিয়েছিলেন। এরপর দিলেন টাকার থলি খুলে।

ছেলের নাম হলো গদাধর। ডাক নাম। ভাল নাম রামকৃষ্ণ।

ক্ষুদিরামের তিন ছেলে রামকুমার, রামেশ্বর, রামকৃষ্ণ। দুই মেয়ে—কাত্যায়ণী আর সর্বমঙ্গলা।

লাহাবাবুদের অতিথিশালায় সাধু সন্ন্যাসীর আনাগোনা। আদুরে গদাই সেখানে যায়।

একদিন চন্দ্রমণি ছেলেকে নতুন কাপড় পরিয়েছেন। কিছুক্ষণ পরে গদাই ফিরে এল। চন্দ্রমণি দেখলেন, কাপড় ছিঁড়ে কৌপীন বানিয়েছে।

গদাধর পাঁচ বছরে পা দিল।

লাহাবাবুদের নাটমন্দিরের পাঠশালায় ভর্ত্তি হলো।

কিন্তু এসব ভাল লাগেনা গদাধরের। অনেক করে বর্ণ পরিচয় শেষ হল। কিন্তু শুভঙ্করী শুনলেই গায়ে জ্বর আসে।

একদিন মধু যুগীর বাড়ীতে বসে গদাই প্রহ্লাদ চরিত্র পড়ছে। সবাই একমনে বসে শুনছে। সামনের গাছে একটা হনুমান বসেছিল

হঠাৎ হনুমানটা এসে গদাইর পা চেপে ধরল। গদাধর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। হনুমান চলে গেল।

একদিন সাথীদের নিয়ে গদাধর মাথুর বিরহের পালা খেলতে খেলতে কেমন যেন আচ্ছন্নের মত হয়ে পড়ল। ছেলেরা ভয় পেয়ে ডাকাডাকি করতে লাগল।

একটি ছেলে এগিয়ে গিয়ে কানের কাছে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ বলতে গদাই জ্ঞান ফিরে পেল।

রামশীলা দেবী ক্ষুদিরামের ছোট বোন। তাঁর উপরে মাঝে মাঝে শীতলা দেবীর ভর হতো। একদিন কামারপুকুরে বেড়াতে এসেছেন। শীতলা দেবী ভর করলেন। সবাই ভয় পেল, কি করবে, কিছু ভেবে পায় না। গদাধরের কিন্তু ভয় নাই। খুঁটিয়ে দেখছে পিসিকে। তারপর বলল, পিসির মত যদি আমার হয়, বেশ হয়।

ক্ষুদিরাম মারা গেলেন। গদাধরের বয়স মোটে সাত।

গদাধর গোঁ ধরেছে ধনী কামারণী, ধাইমা, তার হাত থেকে ভিক্ষা নেবে।

আট বছরে পা দিল। পৈতে হবে। দাদারা ব্যবস্থা করলেন।

রাজকুমার বললেন, বেশ তাই হোক, কিন্তু তুই দরজা খোল্, তুই উপোষ করে থাকবি, আমাদের সহ্য হবে না।

ধর্মদাস লাহার মেয়ে যাচ্ছে বিশালাক্ষীর পূজো দিতে। সঙ্গে আছে আরো মেয়ের দল। গদাই এসে সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আমি যাব।

গদাই চললো মেয়েদের সঙ্গে বিশালাক্ষীর মন্দিরে। ফাঁকা মাঠে এসে গান ধরল বিশালাক্ষীর স্তব।—হঠাৎ একি!—মেয়েরা চমকে উঠল। একি হলো গদাইর! নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে কেন? জ্ঞান নাই যে!

ধর্মদাস লাহার মেয়ে প্রসন্ন বলল, দেবী ভর করেছেন, কানে

দেবীর নাম শোনালে ঘোর কেটে যাবে।

প্রায়ই সমাধিভাব হয় গদাধরের। দেব দেবীর নাম কানে গেলেই গদাধর তন্ময় হয়ে যায়, বিহ্বল হয়ে পড়ে।

চন্দ্রমণি আগে আগে ভয় পেতেন, ভাবতেন, বুঝি দানায় পেয়েছে। এখন আর ভয় পান না।

দাদারা ভাবে বায়ুরোগ।

রাজকুমার ভাইকে কলকাতায় নিয়ে এলেন।

রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে নবরত্ন কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। পূজারী নাই। কৈবর্তের মন্দিরে কোন বামুনই কাজ করতে চায় না।

রাজকুমার পণ্ডিত মানুষ। ঝামাপুকুর টোলের অধ্যাপক। তিনি নিলেন পূজার ভার। গদাধরের আপত্তি। বলে, দাদা তুমি একি করছ? বাবা কোনদিন শূদ্রের যাজন করেননি। তুমি করছ?

একদিন মথুরবাবু দেখলেন গদাধরকে।

ছেলেটি কে?

রাজকুমার বললেন, আমার ভাই।

এখানে এ মন্দিরে আপনার ভাই কাজ করবে?

দেখব জিজ্ঞাসা করে, বললেন রাজকুমার।

একদিন মথুরবাবুর লোক গদাধরের কাছে এসে দাঁড়লে।

বাবু ডাকছেন।

ভাগ্নে হৃদয় কাছে দাঁড়িয়েছিল, বলল, যাও না মামা, এত ভয় কিসের?

ভয় নয়। গদাই বলল, গেলেই বলবেন এখানে থাকো, এখানে চাকরি কর। ও আমি পারব না।

হৃদয় বলল, দোষ কি, মথুরবাবুর মত সৎ লোকের কাছে চাকরি করাতো ভাগ্যের কথা।

তুই চুপ কর। রামকৃষ্ণ বললেন,—চাকরি নিলেই বাঁধা পড়বো। তাছাড়া দেবীর গায়ে অত গয়না, কে ভার নেবে।

হৃদয় বলল, আমি নেব।

সত্যি? গদাধর খুশি হয়ে বলল, আচ্ছা তা হলে চল

মথুরবাবু ঠাকুরকে বললেন, আপনি হবেন দেবীর বেশকারী আর হৃদয় হবে আপনার সাকরেদ।

রাধা-গোবিন্দের পূজারী ক্ষেত্রনাথ গোবিন্দকে নিয়ে পা পিছলে পড়ে গেলেন। গোবিন্দের পা ভেঙ্গে গেল।

রাণী রাসমণি বিধি নিলেন। সকলেই একবাক্যে বলল, নতুন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর ভাঙ্গা বিগ্রহকে গঙ্গায় বিসর্জন দিতে হবে।

রাসমণির মন খুঁত খুঁত করছে। তাইত, এতদিনের ঠাকুরকে ফেলে দিতে হবে।

গদাধরকে জিজ্ঞাসা করতেই গদাধর বলল, রাণীর জামাইর যদি ঠ্যাং ভাঙ্গে তবে রাণী কি করতেন? জামাইকে নিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিতেন? পণ্ডিতেরা হতভম্ব হয়ে গেলেন। তাঁরা অনেক শাস্ত্র বিধি বলে নিজেদের মত প্রমাণ করতে চাইলেন।

রাণীর অনুরোধে গদাধর গোবিন্দের পা এমনভাবে সারিয়ে দিল যে, জোড়ার দাগ পর্যন্ত দেখা গেল না।

বরানগরে গদাধর বেড়াতে আসলেন। সেখানে দেখা জয়নারায়ণ বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে।

বাঁড়ুজ্যে মশাই বললেন, আপনাদের গোবিন্দ কি ভাঙ্গা?

তোমার কি বুদ্ধি গো। গদাধর হেসে উঠলেন, যিনি অখণ্ড-মণ্ডলাকার, তিনি কি কখনো ভাঙ্গা হতে পারেন?

রাধা-গোবিন্দের মন্দিরে গদাধর হলেন পূজারী, আর হৃদয় হল মাকালীর সাজনদার।

রামকুমার খুশি। মন্দিরের কাজে গদাধরের মন গেছে। কিন্তু সংসারের উন্নতি হচ্ছে কই!

একদিন গদাধর ডাক্তারকে বললেন, আচ্ছা তুমি বল দেখি টাকা

ছুলেই আমার হাত বেঁকে যায় কেন ?

বলে কি! ডাক্তার একটি টাকা বার করে গদাধরের হাতে ছোঁয়াল, দেখতে দেখতে গদাধরের হাত বেঁকে গেল।

একদিন রামকুমার বললেন, গদাই তুই কালী মন্দিরে আয়, আমি রাধা-গোবিন্দের পূজা করি।

কেনারাম ভট্টাচার্য্য গদাইকে শক্তি মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন।

রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে, গদাধর একা একা বেরিয়ে যায়। সকাল হলে ফেরে, উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদের মত।

হৃদয় ভাবল, এর পেছনে বোধ হয় কোন রহস্য আছে, জানতে হবে। রাত গভীর হতেই গদাধর বেরিয়ে পড়ে। হৃদয় চুপি চুপি অনুসরণ করে। অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, আমলকী আর অশোক এই পাঁচটি গাছ মিলে বানিয়েছে পঞ্চবটী। গদাইকে সে জঙ্গলে ঢুকতে দেখে হৃদয় অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কি সর্ব্বনাশ! মামাকে নিশ্চয় ভূতে পেয়েছে। না হলে গভীর রাতে উঠে এই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকবে কেন ?

হৃদয় ঢিল ছুঁড়তে লাগল। যদি ভয় পেয়ে মামা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু ভয় পেয়ে হৃদয়ই পালিয়ে গেল।

পূজোয় নিয়মিত বসে না গদাধর। কিসের যেন ঘোর লেগে থাকে দেহ মনে। কখন মূর্তির কাছে বসে কাঁদে, কখন চুপ করে বসে থাকে। কখন বা নিজের মাথায়ই ফুল দেয়।

মূর্তির সামনে বিড় বিড় করে বলে, তুই আমার কথা শুনবি না ?

গদাই অভিমানে ফেটে পড়ে।

একদিন মা কালীর খাঁড়াটি নিয়ে নিজের গলায় বসাতে গেলে মা ভবতারিণী আর থাকতে পারলেন না। এসে হাত চেপে ধরলেন। গদাইর দিব্যদর্শন হলো।

শুধু একবার দেখা দিলেই হবে না। যখন ডাকব তখন আসতে হবে।

মায়ের মুখে অভয় হাসি।

একদিন গভীর রাতে নুপূরের শব্দে গদাধর জেগে উঠল।

কান পেতে শুনল, শব্দটা আসছে মন্দিরের দিক থেকে।

একদিন মন্দিরে ঢুকল গদাধর। মূর্তি নাই, মা বসে আছেন সশরীরে। গদাধর নাকের নীচে হাত রাখল, নিঃশ্বাসের স্পর্শ পেল।

মন্দিরে ভোগ সাজান আছে, মা খাচ্ছেন।

দাঁড়া, আগে মন্ত্রটা বলে নেই, তারপরে খাস্। চেঁচিয়ে উঠল গদাধর।

ছুটে এলো হৃদয়, মামা এ কি করছ? জল বেলপাতা নিবেদন না করে নৈবেদ্যের থালা দিচ্ছ কেন?

কি করব! রাক্ষুসির যে তর সইছে না। নৈবেদ্যের থালা থেকে একমুঠা ভাত তুলে নিয়ে মূর্তির মুখে ঠেকিয়ে গদাধর বলল—খা খা—হঠাৎ সুর বদলে গেল। কি বলছিস? আমি খাব? বেশ খাচ্ছি। বলে, গ্রাসের খানিকটা নিজে খেয়ে, বাকিটুকু দেবীর মুখে দিল।

হৃদয় অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মামা এবার বদ্ধ পাগল হয়েছে। না হলে এরকম কেউ করে! সেজবাবুর কানে গেলেই চাকরী খতম। মামার তো চাকরি যাবেই, সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ও পথে বসবে।

একদিন নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করল—মা মা যে কর, তাঁকে তুমি দেখতে পাও?

দেখতে পাই কি-রে! মার সঙ্গে খাই, বসি, শুই—

নরেন্দ্রনাথ ঠাট্টা করে বললেন,—বটে! এরকম ব্যাপার! ঈশ্বরকে তাহলে দেখা যায়! কোথায়?

প্রতাপ হাজরা দক্ষিণেশ্বরে আস্তানা গেড়েছে।

গদাধর বললেন,—হাজরা শালার পেটে পাটোয়ারি বুদ্ধি ভরা-

ওর কথা কেউ শুনবে না।

নরেনের কিন্তু কথাগুলি মন্দ লাগে না। ঠাকুর ফরমাস করলেন, যো কুছ হ্যায় সো তুহি হ্যায়—গানটা কর দেখি নরেন।

নরেন এসে হাজরার বারান্দায় বসল। হাজরা তামাক সাজছে। হুকোটা নিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল,—যত সব অসম্ভব কথা বলে লোকটি।

কি বলে?

বলে, ঘটি, বাটি, থালা, গ্লাস সব নাকি ঈশ্বর। এমন কি আমরাও।

হাজরা হেসে উঠল। পাগল আর কাকে বলে!

ঠাকুর ঘরে বসে শুনতে পেলেন। উঠে বাইরে এসে নরেনের গায়ে হাত দিয়ে বললেন,—কি হয়েছে রে নরেন?

নরেনের কি হলো! সব কিছুই, চারদিকে সবই ঈশ্বরময়। ভাতের থালা নিয়ে চুপ করে বসে আছে।

মা বললেন,—কিরে বিলে খাচ্ছিস না কেন?

নরেন খেতে লাগলেন। কিন্তু মনে প্রশ্ন, কে খাচ্ছে? কাকে খাচ্ছি?

গদাধর পালা জ্বরে ভুগছেন। ছমাস হয়ে গেল আরাম হচ্ছে না। পঞ্চবটীতে বসে ধ্যান করছেন, শরীর থেকে কে একজন বেরিয়ে এলো। নেশাখোরের মত টলে টলে পড়ছে। আর একজন এলো পিছু পিছু। পরনে গেরুয়া, হাতে ত্রিশূল, বেরিয়েই বিকট দর্শন ছায়া ধরে আক্রমণ করে নিপাত করল।

মথুরের কাছে রাণী শুনলেন সব। ঠিক করলেন, একদিন নিজে গিয়ে সব দেখে আসবেন।

মন্দিরে ঢুকেই বললেন,—একটা গান কর।

গদাধর গান করছে, রাণী চোখ বুজে শুনছেন। হঠাৎ গদাধর গান থামিয়ে এক চড় বসিয়ে দিল। ধমকে উঠল, এখানেও ঐ চিন্তা।

রাণী প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেন। একটা কঠিন মামলার কথা

মনে মনে চিন্তা করছিলেন।

খাজাঞ্জি গোমস্তারা কথাটা মথুরবাবুর কানে দিল।

হৃদয় ভয় পেয়ে ছুটে এলো, এ তুমি কি করছ মামা ?

গদাধর বলল, আমি কি জানি, মা বললেন, এখানেও ও বিষয় সম্পত্তির কথা চিন্তা করছে পিঠে এক ঘা বসিয়ে দে।

মথুরবাবুকে ডেকে পাঠালেন রাণী।

বললেন,—ভটচায ঠিক করেছে। ওর হাত দিয়ে মা আমাকে শাসন করিয়ে নিলেন।

দিনে দিনে পাগলামি বেড়ে চলেছে গদাধরের। মথুরবাবু পর্যন্ত বিচলিত। কলকাতার সেরা কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন ঠাকুরের চিকিৎসার ভার নিলেন।

ঠাকুর বলতেন, ধন্বন্তরী।

ধন্বন্তরীর চিকিৎসায়ও কোন কাজ দিল না।

একদিন মথুরবাবু বললেন,—লালগাছে লাল ফুলই হয়, কই আপনার ভগবান ফোটাক দেখি সাদা ফুল।

পরদিন সকালে বাগানে গিয়ে গদাধর অবাক, একটা ডালে ফুটে আছে একটি লাল ও সাদা জবা। ডালটা ভেঙ্গে তুলে নিলেন।

ঠাকুরের শরীর ভেঙ্গে পড়েছে। মথুরবাবু ভাবলো বোধ হয় ইন্দ্রিয় নিগ্রহে এরকম হচ্ছে। মথুরবাবু গোপনে ফাঁদ পাতলেন। সহর থেকে দুটি পতিতা মেয়ে এনে গদাধরের ঘরে চুপি চুপি পাঠিয়ে দিলেন।

দেখে ঠাকুর মহা খুশি, মা মা এসেছিস ? বলেই পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। ওরা তখন পালিয়ে বাঁচে।

আর একবার চেষ্টা করলেন মথুরবাবু।

গদাধরকে নিয়ে বেড়াতে গেলেন কলকাতায়। মেছুয়া বাজার স্ট্রীটে থামলেন এক বাড়ির কাছে। দোর গোড়ায় অনেকগুলি মেয়ে সাজগোজ করে দাঁড়িয়ে আছে। একটা ঘরে তাদের মাঝখানে

গদাধরকে ছেড়ে দিয়ে মথুরবাবু পালালেন।

মাতৃস্তব সুরু করলেন গদাধর। শিশুর মত হয়ে গেছে, বাহ্যজ্ঞান নাই।

মেয়েরা পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে বললেন, আমাদের ক্ষমা কর।

গোলমাল শুনে মথুরবাবু উঁকি দিলেন।

মেয়ের দল ঝাঁঝিয়ে উঠল,—আপনি বাবাকে এই আস্তাকুড়ে নিয়ে এসেছেন? আপনার কি কোন জ্ঞান নাই?

মথুরবাবু লজ্জা পেলেন। আবার ওদিকে গুরুগর্বে আত্মহারা হলেন।

পানিহাটিতে মহোৎসব। গদাধর গেছে পানিহাটি। বৈষ্ণবচরণ গোস্বামী গদাধরের হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে বললেন, আম কিনে খেয়ো।

গদাধর নেবে না, বৈষ্ণবচরণও ছাড়বে না। গদাধরকে দিয়ে আম কেনালেন, বললেন ভোগ হবে।

গদাধরকে মাঝে বসিয়ে কীর্তন সুরু হলো। দেখতে দেখতে সমাধি হয়ে গেল গদাধরের।

সমাধি ভঙ্গের পরে ভোগের দ্রব্য খেতে দেওয়া হলো। কিন্তু গদাধরের গলা দিয়ে নামে না।

একহাতে টাকা একহাতে মাটি নিয়ে গঙ্গার ধারে বসে গদাধর বলছে—মাটি টাকা, টাকা মাটি। তারপর ছুঁড়ে টাকা মাটি দুইটাই গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিল।

গদাধরের খুড়তুতো দাদা, রামতারক দক্ষিণেশ্বরে এসেছে। গদাধর বলত হলধারী চাকরির খোঁজে এসেছে। পণ্ডিত লোক ভাগবত গীতা বেদান্তে দখল আছে।

একটা কাজকর্ম কিছু চাই, হলধারী সোজা যেয়ে মথুরবাবুকে বললেন।

পরিচয় পেয়ে উৎসাহিত হলেন মথুরবাবু।

গদাধর ঈশ্বরের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। মথুরবাবু বললেন,—ভালই হলো আপনি মায়ের পূজা করুন।

প্রথম পংক্তির বৈষ্ণব পণ্ডিত। এক মুহূর্তের জন্য সঙ্কোচ হলো। কিন্তু পণ্ডিত মানুষ তখনই মনে হলো, কালী আর কৃষ্ণ এক, শক্তিও যা মধুরতাও তা।

হলধারী বললেন, স্ব-পাকে খাবেন।

মথুরবাবু বললেন,—কেন রামকৃষ্ণ ও আপনাদের ভাগ্নে তো প্রসাদ পাচ্ছে।

হলধারী বললেন,—আপনি কার সঙ্গে কার তুলনা করছেন? সে এখন সাধনার উচ্চস্তরে উঠে গেছে। এ সব আচার নিষ্ঠাবোধ ব্যবস্থা তার জন্য নয়। কিন্তু আমার সহ্য হবে না।

একদিন হলধারী আহ্নিক করছে, দেবী এসে সামনে দাঁড়ালেন।

বললেন,—দেখ তুই ভাল চাস তো আমার পূজা ছেড়ে দে। এ রকম পূজা আমার লাগবে না। যদি কথা না শুনিস তোর মঙ্গল হবে না।

হলধারী ভাবল বুঝি চোখের ঘোর। গ্রাহ্য করল না। তারপর দিনই সংবাদ এলো ছেলে মারা গেছে।

হলধারী গদাধরের কাছে গেল।

গদাধর বললেন,—হৃদয়কে কালী পূজা দিয়ে আপনি রাধা-গোবিন্দের পূজা করুন।

হলধারীকে সবাই ভয় করে। বাক্‌সিদ্ধ, কথায় কথায় শাপ দেয়। বিফল হয় না শাপ।

গদাধরের কানে যেতে গদাধর বলল,—ওসব কদাচার এখানে চলবে না। হলধারী হুমকি দিয়ে উঠল,—কি এতবড় কথা। আমার ছোট হয়ে তুই আমাকে শাসন করতে এসেছিস? তোর মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে।

ক'দিন পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা সত্যি সত্যি গদাধরের মুখ দিয়ে

রক্ত উঠতে লাগল।

রক্ত আর থামে না।

ক'দিন ধরে এক সাধু ছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। শুনে দেখতে এলেন। বললেন,—তুমি হঠযোগ কর?

হাঁ।

বেঁচে গেছ। এ রক্ত না পড়লে আরো রক্ত মাথায় যেয়ে উঠলে তোমার সমাধি আর ভাঙত না। হঠযোগে সমস্ত রক্ত মাথায় যেয়ে জমা হয়। সবই মায়ের ইচ্ছা।

হৃদয়কে ডেকে বলল হলধারী,—আচ্ছা তুই বল হৃদয় এই যে পৈতে ফেলে কাপড় ফেলে সাধনা করা, এ রকম করা কি ঠিক? হৃদয় হলধারীকে ভয় পায়।

তাড়াতাড়ি বলল,—কক্ষণ না, একথা আর বলতে?

তাই বল! হলধারী বলল,—কিন্তু আমার মনে হয় পাগল। তবে অলৌকিক পাগল।

হৃদয় বোকা সাজে।

দূর, কি যে বল! তাই কি কখন হয়?

সত্যি করে বল দেখি ওর মধ্যে কিছু আশ্চর্য দর্শন দেখেছিস কি না?

না মামা।

তা না হলে তুই চাকরের মত খাটছিস কেন?

এই হলধারীই একদিন বলল,—রামকৃষ্ণ এবার তোরে চিনেছি।

হলধারী ভাবে আকাট মুর্খ গদাধর শাস্ত্রের মর্ম কি বুঝবে। গদাধরকে ডেকে পাঠাল।

হলধারী বলল,—বোস, তুই কি এ সব কিছু বুঝিস? তুই তো মূর্খ।

গদাধর বলল,—কিন্তু আমার ভিতরে যিনি বসে আছেন তিনি তো মূর্খ নন।

ছেলে মারা যাবার পর থেকে হলধারী মনে করে কালী তমোগুণান্বিতা, তামসিক।

গদাধর শুনতে পেয়ে ক্ষেপে গেল।

তবে রে—ছুটল গদাধর। হলধারী পূজায় বসেছে, যেয়ে ঘাড় চেপে ধরল,—তবে রে শালা, তুই আমার মাকে বলিস তামসিক।

হলধারীর কি হলো কে জানে, ফুল বেলপাতা গদাধরের পায়ে দিয়ে প্রণাম করল।

হৃদয় কাছেই দাঁড়িয়েছিল, শুনিয়ে দিল—

কি গো মামা বলতে না গদাই পাগল হয়েছে। এখন?

কি জানি! হলধারী বলল,—বোধ হয় আমিই পাগল হয়েছি। আমি যেন গদাধরের মধ্যে আমার ইষ্টদেবকে দেখতে পেলাম।

গদাধর আর মন্দিরের পূজা করে না।

চন্দ্রমণি শুনে বললেন,—কেন রে? কি হয়েছে?

তোমার ছেলের মাথা খারাপ হয়েছে। ওকে বাড়িতে নিয়ে এসো।

চন্দ্রমণি রামেশ্বরের কাছে চিঠি পাঠালেন।

গদাধর কামারপুকুরে এলো।

ছেলেকে দেখে চন্দ্রমণি অস্থির হয়ে পড়লেন। এ কি হয়েছে! সব সময় যেন কেমন উন্মনা। কখনো কাঁদছে, কখনো মা মা বলে হেসে উঠছে। চন্দ্রমণি ছেলের গায়ে হাত বুলিয়ে ছেলেকে সুস্থির করেন।

গায়ের লোকেরা বলল, না পাগল হয় নি। হলে চন্দ্রমণিকে এত ভালবাসতে পারত না। ওর কাঁধে ভূত চেপেছে। ওঝা ডাকাও।

ওঝা এলো, মস্ত বড় গুনিন। গ্রামশুদ্ধ লোক ঝেঁটিয়ে এসেছে। চণ্ড এসে অধিষ্ঠান হলো শূন্যে। ওঝাকে বলল, ওকে ভূতে পায় নি। ওর কোন ব্যাধি নাই।

গদাধরকে বলল,—কিহে সাধু, অত সুপুরি খাও কেন, খেয়োনা। ওতে কামভাব বৃদ্ধি হয়।

গদাধর খুব সুপারি খেতেন। ছেড়ে দিলেন।

একদিন অনেক রাত গদাই ফেরে না। চন্দ্রমণি আকুল হয়ে উঠলেন। চন্দ্রমণি রামেশ্বরকে জিজ্ঞেস করলেন, ওকি আজ সারা রাত শশ্মানেই পড়ে থাকবে? রামেশ্বর শশ্মানের কাছে গিয়ে ডাকতেই, গদাধর সাড়া দিয়ে বলল, যাইগো দাদা, তুমি আর এগিয়ো না। আমার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না। তোমাকে পেলে অনিষ্ট করবে।

চন্দ্রমণি আর রামেশ্বর যুক্তি করে। গদাইয়ের বিয়ে দেবে। গদাধরের কানে না যায়। গদাই কিন্তু শুনে খুব খুশি। বিয়ে হবে, গদাইর খুব আনন্দ। ঘটক লাগান হলো। হৃদয়ের দাদা লক্ষ্মী মুখুজ্জেকে।

একদিন গদাই দেখল তার শরীর থেকে দুটি ছেলে বেরিয়ে মাঠময় ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। অনেকদিন পরে ভৈরবী যোগেশ্বরী শুনে বলল, নিতাই গৌর।

একদিন গদাধর মাকে বলল, তোমরা জয়রামবাটি রামচন্দ্র মুখুজ্জের বাড়ি যাও সেখানে মেয়ে আছে।

জয়রামবাটিতে বিয়ে। গদাধর যাবে বিয়ে করতে।

গদাধরের মেজ বউ ঠাকরুণ বলল,—একটা বাজনা না থাকলে বিয়ে জমে!

গদাধর বলল, দাঁড়াও আমি বাজনা বাজাচ্ছি। দুহাতে গাছা বাজিয়ে মুখে ঢোলের বোল বলতে বলতে গদাধর বিয়ে করতে গেল।

সবাই ধরল বরকে গান করতে হবে।

গদাধর বলল, আচ্ছা। মুক্ত গলায় শ্যামাসঙ্গীত আরম্ভ করল। যে যেখানে ছিল সব স্তব্ধ। গদাধর মেয়েদের পায়ে লুটিয়ে প্রণাম করছে, মা মা সর্বত্রই তুই, সর্বত্রই তোর আনন্দের ছড়াছড়ি।

আমাকে রসে বশে রাখিস মা শুধুকে সাধু করিস না!

বিষ্ণু ঘরের গয়না চুরি গেল। মথুরবাবু গদাধরকে বললেন,—ছিঃ ঠাকুর তুমি তোমার গয়না রক্ষা করতে পারলে না?

ঠাকুর বললেন,—তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি। স্বয়ং লক্ষ্মী যার দাসী তাঁর কি ঐশ্বর্য্যের অভাব? ও গয়না তোমার কাছে একটা কিছু কিন্তু ভগবানের কাছে মাটির জ্বালা।

ঠাকুর যখন কলকাতায় আসতেন হৃদয় তাঁকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাত।

একদিন হৃদয় লাট সাহেবের বাড়ি দেখিয়ে বলল, দেখ মামা লাট সাহেবের বাড়ি। থামগুলি দেখ কত বড়।

ঠাকুর থাম দেখতে পেলেন না, দেখলেন কতকগুলি মাটি চাকচাক করে পর পর সাজান আছে।

শম্ভু মল্লিক মস্ত বড়লোক। মা'কে খুব ভক্তি করে। মথুরবাবু মারা গেলে মা'র নির্দেশে তিনিই হলেন ঠাকুরের রসদদার।

গদাধর কামারপুকুর এসে এবার দু'বছর কাটিয়ে গেলেন। শরীর খারাপ বলে চন্দ্রমণি তাঁকে যেতে দেয় নি।

দক্ষিণেশ্বরে ফিরেই গদাধর আবার আগের মত। মথুরবাবু আবার গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে নিয়ে এলেন। সেখানে আর একজন বৈদ্য বসেছিলেন। তিনি বললেন, ওষুধে এ অসুখ সারবে না।

চন্দ্রমণির কাছে সংবাদ গেল। চন্দ্রমণি বুড়ো শিবের মন্দিরে হত্যা দিলেন। প্রত্যাদেশ পেলেন, মুকুন্দপুরে যা। সেখানে গিয়ে হত্যা দে।

চন্দ্রমণি ছুটলেন মুকুন্দপুরে। হত্যা দিয়ে পড়ে রইলেন।

প্রত্যাদেশ পেলেন, তুই ঠাণ্ডা হয়ে বাড়ি যা। তোর ছেলের মনে ঈশ্বরের সঞ্চার হয়েছে। তোর কোন ভয় নাই।

চন্দ্রমণি আশ্বস্ত হয়ে বাড়ি ফিরলেন।

ঠাকুর মহাদেব স্তোত্র পড়ছেন। পড়তে পড়তে ভাবে বিভোর হয়ে গেলেন।

মন্দিরের আমলারা ছুটে এলো, ছোট ভটচাজ আবার ক্ষেপে গেছে। আজ সেজবাবু উপস্থিত আছেন। ধর, ধরে পাগলকে বেঁধে রাখ।

গোলমাল শুনে মথুরবাবু এসে দাঁড়ালেন। মোহিত হয়ে গেলেন। শিবভাবে বিভোর গদাধর।

কে যেন বলে উঠল, পাগলাকে ধরে সরিয়ে নিয়ে যান, নয়ত কখন কি অঘটন ঘটবে ঠিক কি ?

মথুরবাবু গর্জে উঠলেন, খবরদার, কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে ভটচাযের গায়ে হাত দেবে ?

মথুরবাবু দাঁড়িয়ে আছেন মুগ্ধ নেত্রে।

জ্ঞান ফিরে এলে গদাধর দেখলেন, এখানে ওখানে অনেক লোক জমা হয়েছে। মাঝখানে মথুরবাবু।

ঠাকুর বললেন,—কিছু অঘটন করে ফেলিনি তো ?

না বাবা, তুমি স্তব করছিলে আমরা শুনছিলাম।

আর একদিন বারান্দায় পায়চারি করছেন গদাধর। কাছারি বাড়ি থেকে বেশ দেখা যায়। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মথুরনাথ ছুটে এসে ঠাকুরের পায়ে পড়লেন।

ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন,—একি ! একি করছ তুমি ? রাণীর জামাই, গণ্যমান্য লোক, লোকে দেখলে কি বলবে ?

কিন্তু সে কথা মথুরবাবুর কানে যায় না।

বললেন,—আমি পরিষ্কার দেখেছি, যখন আপনি পুব থেকে পশ্চিমে আসেন, তখন দেখি যেন মা মন্দিরে যাচ্ছেন। আবার যখন পশ্চিম থেকে পুবে যান, তখন দেখি স্বয়ং ভোলানাথ। আজ অপরূপ দর্শন হলো।

শেষ শয্যায় রাণী রাসমণি শুয়ে আছেন।

বড় মেয়ে পদ্ম দক্ষিণেশ্বরের দানপত্রে সই দেবে না।

দেবীপূজার জন্য আড়াই লক্ষ টাকার জমিদারী কিনেছেন। কিন্তু এখনও দেবোত্তর করে দেননি। চার মেয়ের মধ্যে দু' মেয়ে বেঁচে আছে। জগদম্বা আর পদ্ম। জগদম্বা দানপত্রে স্বাক্ষর দিয়েছে। পদ্ম দেয়নি।

রাসমণি মৃত্যুশয্যায় শুয়েও শান্তি পাচ্ছেন না।

দক্ষিণেশ্বরে যদু মল্লিকের বাগানে যতীন্দ্র ঠাকুর বেড়াতে এসেছেন। ঠাকুর গেছেন সেখানে।

যতীন্দ্র বললেন,—আমরা সংসারী লোক, আমাদের কি আর মুক্তি

আছে। স্বয়ং যুধিষ্ঠিরই নরক দর্শন করেছিলেন, আমরা তো কোন ছার।

ঠাকুরের রাগ হলো। বিরক্ত হয়ে বললেন,—যুধিষ্ঠিরকে বুঝতে গিয়ে ঐ নরক দর্শনটুকু মনে আছে! সত্য, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বৈরাগ্য, কৃষ্ণভক্তি এ সবগুলি বুঝি নজরে পড়ে না।

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। হৃদয় তাড়াতাড়ি মামার মুখ চেপে ধরল।

আমার একটু কাজ আছে বলে যতীন্দ্রবাবু সরে পড়লেন।

গদাধর বাঁশ কাঁধে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কাঙ্গালী ভোজন হয়েছে, গদাধর তাদের পাতা চাটছে।

হলধারী ছুটে এলো,—তুই এ সব কি করছিস? কাঙ্গালীদের এঁটো খাচ্ছিস, তোর ছেলেমেয়ের বিয়ে হবে না।

কথা শুনে ঠাকুর ক্ষেপে গেলেন। বাঁশ তুলে বললেন,—তবে রে শালা, তুমি না গীতা বেদান্ত পড়? তুমি না শেখাও জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য, আর সর্বভূতে তোমার না ব্রহ্ম দৃষ্টি? ভেবেছ আমি জগৎ মিথ্যা বলব আর ছেলেপুলের বাপ হবো? তোর শাস্ত্র পাঠের মুখে আগুন।

রাসমণির সম্পত্তির এক্সিকিউটিভ হলেন মথুরবাবু।

একদিন ঠাকুরকে বললেন,—আপনার নামে কিছু জমি দানপত্র করে দিই—

তবে রে শালা—ঠাকুর বাঁশ নিয়ে উঠলেন। আমাকে সংসারে জড়াবার মতলব? আমি কি কলাইর ডালের খদ্দের?

একদিন বকুলতলার ঘাটে এসে নৌকা থামল। বাগানে ঠাকুর ফুল তুলছিলেন। এ কে! গেরুয়া পরা, হাতে ত্রিশূল। সন্ন্যাসিনী।

গদাধর তাড়াতাড়ি ফিরে এসে হৃদয়কে বলল—ওরে হৃদে ঘাটে গিয়ে ভাখ এক ভৈরবী এসেছে। তুই গিয়ে বল আমি এখানে আছি।

ভৈরবী ঠাকরুণকে বলল,—আমাকে তুমি খুঁজে বেড়াচ্ছ মা,

আমার কথা তুমি জানলে কি করে?

মা মহামায়া জানিয়ে দিয়েছে। দুজনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। বাকি তুমি। ভৈরবী বলল,—শুধু জেনে রাখ যশোহর জেলায় আমার বাড়ি আর ব্রাহ্মণ ঘরে আমার জন্ম। যোগেশ্বরী বলে ডাকবে।

ভৈরবী বলে ঠাকুর অবতার।

তোতাপুরীকে দেখে ঠাকুর জিগ্যেস করলেন, আপনি কি তোতাপুরী?

তোতাপুরী অবাক। নাম জানল কি করে?

হাঁ, আমি তোতাপুরী। তুমি সাধন ভজন কিছু করবে?

আমি কি জানি?

তবে কে জানে?

মা জানেন।

কে তোমার মা?

মন্দিরের দিকে ইঙ্গিতে গদাধর দেখিয়ে দেয়।

তোতাপুরীর মুখে বিদ্রূপের হাসি। ওতো একটা পুতুল। বেশ যাও, তোমার মাকে জিজ্ঞেস করে এসো।

একদিন হাজির হল গৌরীকান্ত তর্কভূষণ। গৌরীকান্ত তান্ত্রিক।

যেমন পণ্ডিত তেমনি তার্কিক। কালীমন্দির প্রাঙ্গনে ঢুকে হুঙ্কার ছাড়ল গৌরীকান্ত।

চীৎকার শুনে চমকে উঠল গদাধর। স্তোত্রাংশ আবৃত্তি করছে গৌরীকান্ত। গদাধরও আবৃত্তি করে উঠল। গৌরীকান্তর চেয়ে প্রবলতর পুরুষের কণ্ঠে।

যে যেখানে ছিল হকচকিয়ে উঠল। ছুটে এলো কি ব্যাপার? কে এমন ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করে।

গৌরী পণ্ডিতের সঙ্গে পাগলা পুরোতের প্রতিযোগিতা হচ্ছে।

কার গলায় কত জোর।

পাগলা পুরোতের গলায় এত জোর! সবাই অবাক হয়ে গেল।

গৌরী পণ্ডিত হেরে গেল।

এতদিন তর্কে অজেয় ছিল গৌরীকান্ত। দেখলো তার চেয়েও আশ্চর্য শক্তিধর আছে। গৌরী পণ্ডিত গদাধরের কাছে আত্মসমর্পণ করল।

মথুরবাবুর ইঙ্গিতে নাটমন্দিরে বিচার সভা বসেছে। বৈষ্ণবচরণের সঙ্গে তর্ক হবে গৌরী পণ্ডিতের। সে সভায় যাবার আগে গদাধর কালী প্রণাম করে বেরিয়ে আসছে, বৈষ্ণবচরণ গদাধরের পায়ে পড়ল।

মুখে মুখে সংস্কৃত শ্লোক বানিয়ে গদাধরের স্তব করতে লাগল।

গৌরী পণ্ডিত উপস্থিত পণ্ডিত মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে বলল, আপনারা এসেছেন আমার ও বৈষ্ণবচরণের তর্কযুদ্ধের বিচার করতে। কিন্তু সে যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। বৈষ্ণবচরণ আজ বিষ্ণুচরণের স্পর্শ পেয়েছে। তাকে পরাস্ত করা মানুষের অসাধ্য।

শোন এদিকে আয়, ঠাকুর একদিন নরেনকে চুপি চুপি ডেকে নিলেন। আমার মধ্যে অষ্টসিদ্ধি আবির্ভূত হয়েছে। তোকে সব দিয়ে যেতে চাই।

আমাকে?

হাঁরে তুই ছাড়া আর কাকে! তোকে অনেক কাজ করতে হবে, ধর্ম প্রচার করতে হবে। বল নিবি?

ওসব নিলে আমার ঈশ্বর লাভ হবে?

তা হবে না।

তবে আমার ওসবে দরকার নাই। নরেনের গলায় কঠিন দৃঢ়তা, যা দিয়ে ঈশ্বর লাভ হবে না তা দিয়ে আমার দরকার নাই।

একদিন নরেন ঠাকুরকে বলল—

এ আমার কি হয়েছে বলুন তো?

কি হলো ?

ধ্যানে বসে আমি দূরের জিনষ দেখি, দূরের শব্দ শুনি। কোন বাড়িতে কে কি করছে, কে কি বলছে, সব শুনতে পাই। সব দেখতে পাই।

ঠাকুর বললেন, এ সব সিদ্ধাই। তোকে ভোলাতে এসেছে। দিন কতক ধ্যান বন্ধ রাখ।

স্ত্রীলোক মাত্রেই গদাধরের কাছে মা।

এক রাত্রে যোগেশ্বরী কোত্থেকে এক পূর্ণ যুবতীকে এনে বিবস্ত্র করে বেদীর উপরে বসিয়ে রাখলে।

শিউরে উঠল গদাধর।

ভৈরবী বলল, বাবা সাক্ষাৎ জননী জ্ঞানে এর কোলে যেয়ে বসো।

একি বলছিস মা ! আমি কি তোর দুর্বল সন্তান আমাকে এসব কি বলছিস ?

কে বলে তুই আমার দুর্ব্বল সন্তান। সবচেয়ে জোরদার তুই। যা বললাম তা কর।

রমণীর কোলে বসেই সমাধিস্থ হয়ে পড়ল গদাধর।

যোগেশ্বরী বলল, বাবা তুমি পরীক্ষা পার হয়ে গেছ।

চন্দ্রমণি আছেন দক্ষিণেশ্বরে ছেলের কাছে। মথুরবাবুর এমনিতে খুব হাত টান। কিন্তু চন্দ্রমণির বেলায় দরাজ।

একদিন বললেন, আচ্ছা ঠাকুরমা তুমি তো কোনদিন আমার কাছে কিছু চাইলে না।

হাসলেন চন্দ্রমণি।

কি চাইব বাবা, আমার তো কোন অভাব নাই।

তবু তুমি কিছু চেয়ে নাও—যা তোমার খুশি।

কি চাইব ! সবই তো আছে।

মথুরবাবুর পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত চন্দ্রমণি বললেন, আচ্ছা তা হলে আমাকে চার পয়সার দোক্তা পান এনে দিও।

একদিন রামকৃষ্ণ তোতাপুরীকে বললেন, তুমি ব্রহ্ম লাভ করেছ, তবু তুমি নিত্য ধ্যানের অভ্যাসটুকু রেখেছ কেন ?

তোতাপুরী প্রতিদিন লোটা মাজতেন।

লোটাটাকে দেখিয়ে বললেন, তা হলে ও রকম চকচকে থাকবে।

ঠাকুর বললেন, আর লোটা যদি সোনার হয় ? নিকৃষ্ট ধাতু বলেই তুমি ওকে রোজ পরিষ্কার করছ। উৎকৃষ্ট হলে প্রয়োজন হতো না।

কালীবাড়ির বাগানে নতুন ঘাস উঠেছে। কে যেন সে ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, রামকৃষ্ণ চিৎকার করে উঠলেন, ওরে হাঁটিস না, হাঁটিস না আমার লাগছে।

আর একদিন নদীর ঘাটে মাঝিরা মারামারি করছে। একজন আর একজনের পিঠে সজোরে চড় মেরে বসল। যন্ত্রণায় রামকৃষ্ণ চেঁচিয়ে উঠলেন।

শুনে হৃদয় ছুটে এল। দেখল রামকৃষ্ণের পিঠ লাল হয়ে ফুলে উঠেছে।

একি ! কে তোমাকে মেরেছে মামা ? নাম বল তাকে আমি একবার দেখে নিচ্ছি। আগুন হয়ে উঠল হৃদয়।

রামকৃষ্ণ শুধু কাঁদেন।

তারপর বললেন, কেউ না এক মাঝি আর এক মাঝিকে মেরেছে। কিন্তু সেওতো আমাকেই মারা।

আরে কেঁও রোটি ঠোকতে হো ?

হাততালি দিয়ে রামকৃষ্ণ গান করছেন। বিধিবদ্ধ সমাধি লাভের পরে এ আবার কি ছেলেমানুষী !

বিরক্ত হলেন তোতাপুরী।

ঠাকুর বললেন, দূর শালা ! আমি ঈশ্বরের নাম করছি, শুনতে পাচ্ছনা ?

গভীর রাত্রে ধ্যানে বসবার উদ্যোগ করছেন তোতাপুরী। হঠাৎ একটা লোক গাছ বেয়ে নিচে নেমে এল।

—কে তুমি ?

—আমি ভূত, ভৈরব। তুমি কে ?

তুমিও যা আমিও তা। তোতাপুরী বললেন।

আমি তো ভূত।

হলেই বা। তোমাতে আমাতে কোন তফাৎ নাই। তোতাপুরী বললেন, এখানে এসে বসো, ধ্যান কর। বলে নিজের পাশটি দেখিয়ে দিলেন।

ভূত মিলিয়ে গেল।

পরদিন তোতাপুরী রামকৃষ্ণকে বললেন।

জানি! রামকৃষ্ণ বললেন, অনেকবার তাকে দেখেছি।

ভয় পাও নি ?

ভয় পাব কেন!—আমাকে কত ভবিষ্যত সে বলে দিয়েছে।

তোতাপুরী গেল। এল গোবিন্দ রায়।

ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। ঘুরতে ঘুরতে দক্ষিণেশ্বরে এল।

গোবিন্দ রায় দরবেশ, সুফি পন্থী।

রামকৃষ্ণ ছুটে গেলেন, কি হে এসেছ ? আমাকে দীক্ষা দাও।

তুমি মুসলমান হবে ?

হ্যাঁ। তুমি আমাকে দীক্ষা দাও।

গোবিন্দ রায় দীক্ষা দিলেন রামকৃষ্ণকে।

রামকৃষ্ণ কাছা খুলে ফেললেন, মুখে মা ডাক নাই, শুধু আল্লা আল্লা।

মন্দিরের ধারে কাছেও যান না।

একদিন মথুরবাবুকে বললেন, মুসলমানের রান্না খাব।

সে কি কথা ?

হ্যাঁ খুব ঝাল পেঁয়াজ রশুন দিয়ে।

মথুরবাবু রাজী হল না।

বেশ মুসলমান দেখিয়ে দেবে, হিন্দু রাঁধবে।

ঠাকুর বললেন, বেশ তাই হোক। তাড়াতাড়ি কর।

রান্না হচ্ছে। রামকৃষ্ণ বাতাসে গন্ধ পাচ্ছেন। হঠাৎ মথুরবাবুকে ডাকিয়ে বললেন, এ হচ্ছেনা, বামুনকে কাছা খুলে ফেলতে বল। আমাকে মুসলমান বলে ভাবতে দাও।

সানকিতে ভাত খেলেন আর বদনায় জল খেলেন রামকৃষ্ণ।

হৃদয় শুনতে পেয়ে তেড়ে এলো। ধরে নিয়ে গেল মামাকে মন্দিরে।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই রামকৃষ্ণ অদৃশ্য, মন্দিরে নাই। হৃদয় চারিদিকে খুঁজতে লাগল। শেষে পেল যেয়ে মসজিদে।

সকাল বেলায় আজান শুনতে রামকৃষ্ণ ছুটলেন।

তুমি কে? প্রথম দিন জিজ্ঞেস করেছিল মুসলমানেরা।

একদিন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ রামকৃষ্ণকে দেখা দিলেন। রামকৃষ্ণ নমাজ পড়তে এসেছে। দেখলেন একজন ফকির মাথার চুল দাড়ি সাদা, গলায় কাঁচের মালা, জ্যোতির্ময় দেহ। বললেন, তুমি এসেছ বেশ—।

এই ইসলামভাবটি রামকৃষ্ণের তিন দিন ছিল।

মাইকেল মধুসূদন এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে।

বারুদঘর নিয়ে কোম্পানির সঙ্গে মামলা চলছে, সেজন্য মথুরবাবুর ছেলে তাকে এনেছে।

মাইকেল বললেন শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখব।

খবর গেল রামকৃষ্ণের কাছে। রামকৃষ্ণ যেতে চায় না। অতবড় গন্যমান্য লোক, দুর্দান্ত সাহেব, তার কাছে যাব কি!

হৃদয়কে বললেন, তুই যা।

আবার তাগিদ এল।

রামকৃষ্ণ সঙ্গে করে নারায়ণ শাস্ত্রীকে নিয়ে গেলেন। কি জানি যদি ইংরাজি ফিংরাজি বলে বসে।

রামকৃষ্ণ এগিয়ে দিলেন নারায়ণ শাস্ত্রীকে।

নারায়ণ শাস্ত্রী সংস্কৃতে কথা বললেন।

মাইকেল বললেন, বাংলা ভাষাতে বলুন।

শাস্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নিজের ধর্ম ছাড়লে কেন ?

মাইকেল পেট দেখিয়ে বললেন, পেটের জন্য।

পেটের জন্য ! নারায়ণ শাস্ত্রী আগুন হয়ে উঠলেন, পেটের জন্য তুমি বাপ পিতামহের ধর্ম ছাড়লে ?

মাইকেল রামকৃষ্ণকে বললেন, আপনি কিছু বলুন।

রামকৃষ্ণ বললেন, কে যেন আমার মুখ চেপে ধরছে। তার চেয়ে তুমি গান শোন।

রামকৃষ্ণ প্রসাদী গান শোনালেন।

মথুরবাবুর স্ত্রী জগদম্বার মরণাপন্ন অসুখ। বাঁচবার কোন আশা নাই। রামকৃষ্ণের পায়ের উপরে এসে পড়লেন।

বাবা, আমার যা হবার হবে। কিন্তু তোমার সেবা হবে কি করে ?

রামকৃষ্ণ বললেন, যাও বাড়ি যাও। তোমার স্ত্রী ভাল হয়ে গেছে।

মথুরবাবু বাড়ি ফিরলেন। বাড়ি ফিরে অবাক হয়ে গেলেন, একি ইন্দ্রজাল না আর কিছু! যাবার সময় যাকে দেখে গেলেন এখন তখন অবস্থা সে দিব্যি উঠে বসেছে !

রামকৃষ্ণ ভুগলেন ছয় মাস।

ঠিক হল সামনে বর্ষা আসছে, এসময়টা রামকৃষ্ণ দেশের বাড়িতে যেয়ে থাকুন।

মথুরবাবু আর জগদম্বা সব গোছগাছ করে দিলেন, যেন রামকৃষ্ণের কোন অসুবিধা না হয়।

গ্রামে রটে গেছে, রামকৃষ্ণ আসছে সঙ্গে একজন ভৈরবী, তার হাতে একটা মস্ত ত্রিশূল। জয়রামবাটিতে সারদাকে খবর পাঠালেন রামকৃষ্ণ।

ঘরের বার হলেই মেয়ে পুরুষ সব হাঁ করে তাকিয়ে রামকৃষ্ণকে

দেখে।

একদিন হৃদয় আর রামকৃষ্ণ ভূতির খালের দিকে বেড়াতে গেছে। মেয়েরা খালে জল ভরতে এসেছে। রামকৃষ্ণকে দেখে একজন আর একজনকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে লাগল।

ও হৃদে, আমায় ঘোমটা দিয়ে দে—

হৃদয় অবাক! কি বলছ মামা?

দিয়ে দে, ওরা আমার বাইরের রূপ দেখছে। শিগগির আমায় ঘোমটা দিয়ে দে না হলে আমি ন্যাংটা হব।

না মামা, হৃদয় বলল,—এখানে ন্যাংটা হয়ো না, ভাল দেখাবে না। আমি তোমার মুখ ঢেকে দিচ্ছি।

একদিন রামকৃষ্ণ আর হৃদয় খেতে বসেছে।

রেঁধেছে লক্ষ্মীর মা আর সারদা।

রামকৃষ্ণ বললেন,—ও হৃদে খেয়ে দেখ লক্ষ্মীর মা রেঁধেছে যেন রামাস বদ্যি। আর তোর মামি রেঁধেছে যেন শ্রীনাথ সেন হাতুড়ে।

হৃদয় বলল, তা হোক। তবু তুমি সব সময় এ হাতুড়েকে গা টিপতে পা টিপতে পাবে। ডাকলে হলো। আর রামদাস বদ্যির বড় বেশী ভিজিট। আগে তো লোকে শ্রীনাথ সেনকেই ডাকে।

এলেও ঘোমটা দিয়ে স্বামীর কাছে এসে দাঁড়ায় সারদা। যখন পাশে এসে বসে তখনো ঘোমটা খোলে না।

কি করে সলতে পাকাতে হয়,—ট্রেনে, নৌকায় চড়তে হয়,— ঘর সংসারের ছোট বড় সব কাজই সারদাকে শেখান রামকৃষ্ণ।

জয়রামবাটির ক্ষেত্র বিশ্বাসের মেয়ে ভানুদাসী। কুড়ি বছর বয়সের বিধবা। সারদার উপরে বড় টান। রামকৃষ্ণকে লোকে বলে খ্যাপা জামাই। ভানু পিসি কিন্তু ঠিক বুঝেছিল।

মেয়ে মহল ভিড় করে এলে খ্যাপা জামাই এমন সব কথা বলে যে হাসতে হাসতে মেয়েদের পেটের নাড়ি ছিড়ে যায়। লজ্জায়

পালাবার পথ পায় না।

রামকৃষ্ণ বলে, বেশ হলো আগড়াগুলো সব উড়ে গেল। এবার বসো গোল হয়ে।

একদিন ভানু পিসিকে রামকৃষ্ণ বললেন, আমাকে পানের খিলি তৈরি করে খাওয়াতে পারিস?

জয়রামবাটি থেকে কামারপুকুর ফিরছেন রামকৃষ্ণ।

ভানু পিসি পান তৈরি করে আনতে আনতে রামকৃষ্ণ অনেক দূরে চলে গেছেন! ভানু পিসি খিলি হাতে করে পিছনে ছুটলেন।

রামকৃষ্ণ শিওরে এসেছেন, দিদি হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে দেখা করতে। হেমাঙ্গিনী কতগুলি ফুল যোগাড় করে রেখেছে।

কোন বারণ শোনেনা পাদ বন্দনা করবে। হেমাঙ্গিনী বলল, আমাকে বর দাও আমি যেন সজ্ঞানে কাশীতে গঙ্গালাভ করি।

হৃদয় ভাবে আমার তো মামাই আছে আমার ভাবনা কি? মামা তো আর আমাকে ফেলে দেবে না। সাধন ভজন দিয়ে আমার কি হবে।

ডঙ্কা মেরে বেড়ায়, আর বিষয়-আশয়ের ফিকিরে থাকে।

ঠিক এমনি সময়ে হৃদয়ের স্ত্রী বিয়োগ হলো। মুহূর্তের মধ্যে হৃদয়ের ভিতরে সব উলটো মুখো হলো।

সব ছেড়ে দিয়ে ধ্যানে মেতে উঠল।

একদিন গিয়ে রামকৃষ্ণকে ধরল, মামা আমাকে তোমার মত ভাব টাব কিছু দাও।

রামকৃষ্ণ বললেন, ওসবে তোর দরকার নাই।

খুব আছে তুমি দেবে কিনা বল। হৃদয় ছাড়তে চায় না।

রামকৃষ্ণ বললেন, আমি কি জানি, মাকে ধর মা যদি দেয় তবে হবে।

বেশ। হৃদয় বলল, মাকে ধরব।

আস্তে আস্তে হৃদয়ের দর্শন হতে লাগল।

মথুরবাবু প্রমাদ গণলেন।

রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, এসব কি, হৃদয়ের আবার এসব হচ্ছে কেন ?

ঠাকুর বললেন, চিন্তা নাই, ভুদিনে সব ঠিক হয়ে যাবে।

মথুরবাবু বুঝলেন এসবই রামকৃষ্ণের লীলা।

একদিন ধ্যানে বসে হৃদয় হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ও রামকৃষ্ণ দাঁড়াও আমরা দুজনেই ভগবানের অবতার, চল দেশে দেশে গিয়ে জীব উদ্ধার করি।

রামকৃষ্ণ উঠে এসে হৃদয়ের বুকে হাত ঠেকিয়ে বললেন, দে মা শালাকে জড় করে।

দিব্য-দর্শন মুহূর্তে ছুটে গেল। হৃদয় কেঁদে ফেলল। মামা আমাকে একি করলে ?

তোকে একটু চুপ করিয়ে দিলাম।

হৃদয় ঠিক করল পঞ্চবটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ যে জায়গাটুকুতে বসে ধ্যান করতেন, সেখানে বসে ধ্যান করতে হবে। হয়ত জায়গার কিছু গুণ আছে।

সেখানে গিয়ে ধ্যানে বসেই হৃদয় চেঁচিয়ে উঠল, জ্বলে গেলাম, জ্বলে গেলাম।

রামকৃষ্ণ আর্তনাদ শুনতে পেয়ে ছুটে এলেন।

কি হয়েছে রে হৃদে ?

জ্বলে গেল মামা, জ্বলে গেল। এখানে ধ্যানে বসা মাত্র কে যেন গায়ে এক মালশা গরম আগুন ঢেলে দিল।

রামকৃষ্ণ গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন।

হৃদয় সুস্থ হলো।

ভাইপো অক্ষয় এসেছে বিষ্ণুমন্দিরের পূজারী হয়ে। বড় ভক্তিভরে পূজা করে। অক্ষয়ের বিয়ে হল। বিয়ের পরেই অক্ষয় অসুখে পড়ল।

রামকৃষ্ণ হৃদয়কে ডেকে বললেন, হৃদের লক্ষণ বড় খারাপ, ছোঁড়া

বাঁচবে না। অন্তিম মুহূর্তে রামকৃষ্ণ পাশে বসে বললেন, অক্ষয় বলো, গঙ্গা, নারায়ণ, ওঁ রাম।

মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল হৃদয়। রামকৃষ্ণ ভাব ভূমিতে চলে গেছেন। হৃদয় যত কাঁদে, রামকৃষ্ণ তত হাসেন।

পরদিন যখন দাহ করে সবাই ফিরে এলো, রামকৃষ্ণ কেঁদে উঠলেন।

মথুরবাবুর অসুখ। ফোড়ার যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন। হৃদয়কে বলে পাঠালেন, বাবা যেন একটিবার আসেন।

রামকৃষ্ণ বললেন, আমি যেয়ে কি করব? আমি কি ফোঁড়া ভাল করতে পারি?

রামকৃষ্ণ গেলেন না।

মথুরবাবু আবার ডেকে পাঠালেন।

রামকৃষ্ণ এবার না যেয়ে পারলেন না।

অনেক কষ্টে তাকিয়া ভর দিয়ে উঠে মথুরবাবু বললেন, বাবা একটু পায়ের ধূলো দাও।

তুমি কি ভেবেছ আমার পায়ের ধুলোয় ফোঁড়া ভাল হবে? রামকৃষ্ণ বললেন।

বাবা আমি কি এমনি? মথুরবাবু বললেন, আমি কি ফোঁড়ার জন্য তোমার পায়ের ধুলো চাই? আমি চাই ভব সাগর পার হবার জন্য।

দেখতে দেখতে রামকৃষ্ণের ভাব সমাধি হলো। মথুরবাবু দুই পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন।

এক এক সময় এক গোঁ আসে মথুরবাবুর। একবার বিজয়া দশমীর সময় এমনি হয়েছিল। বলেছিলেন, প্রতিমা বিসর্জন হবে না। নিত্য পূজা হবে। কোন কথাই শুনলেন না মথুরবাবু, এমনকি জগদম্বার অনুরোধও রাখলেন না।

জগদম্বা রামকৃষ্ণকে সংবাদ পাঠালেন।

মথুরবাবু ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন, চোখ উদ্‌ভ্রান্ত।

বলছেন, না বিসর্জন দেওয়া হবে না। মা'কে ছেড়ে আমি বাঁচতে পারব না।

ঠাকুর তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, মা'কে ছেড়ে কেউ বাঁচতে পারে না। বিসর্জন দিলেই মা যাবেন কোথায়? তিনদিন বাইরের দালানে পূজো নিয়েছেন। আজ থেকে ভিতর দালানে পূজা নেবেন।

১২৭৮ সালের শেষের দিকে মথুরবাবু জ্বরে পড়লেন। জ্বর বিকারে দাঁড়াল। রামকৃষ্ণ গিয়েছেন দেখা করতে।

মথুরবাবু বললেন, আচ্ছা বল, সেই যে তুমি বলেছিলে তোমার ভক্ত আসবে কই তারা তো এলো না।

রামকৃষ্ণ বুঝতে পারলেন এবার মা নিজে এসে মথুরবাবুকে নিয়ে যাবেন।

নিজে আর যান না রামকৃষ্ণ, রোজ পাঠান হৃদয়কে।

রামকৃষ্ণ একদিন ভক্তদের বললেন, জানিস আমাকে দেখে সে কি বলত? বলত বাবা তোমার ভিতরে শুধু ঈশ্বর আছে।

আচ্ছা মশাই, কে একজন একদিন রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করল, মৃত্যুর পরে মথুরবাবুর কি হলো?

ঠাকুর বললেন, ওরে বাসনায় আগুন দে।

বড় তক্তপোশটিতে বসে আছেন রামকৃষ্ণ। ছোটটিতে শুয়ে আছেন সারদা। ধড়ফড় করে উঠে বসলেন সারদা। একি তিনি এখনও শোননি? বিছানার উপরে বসে আছেন, নিশ্চল হয়ে।

এমন ভাবারূঢ় মূর্তি আর কখনও দেখেননি সারদা। ভয় করতে লাগল।

ঘর থেকে বেরিয়ে ঝি কালীকে বললেন, শিগগির ভাগ্নেকে ডেকে আন। ঠাকুর যেন কেমন হয়ে আছেন।

হৃদয় এসে নাম শোনাতে বসল।

কাশীপুরের মহিমাচরণ ঠাকুরের ভক্ত। কিন্তু পাণ্ডিত্যাভিমানই

সব পণ্ড করেছে। ভক্তির চেয়ে শাস্ত্রের উপরে টান বেশী। খুব পড়াশুনা করেছে, এমনি একটা ভাব সব সময়ই দেখায়। ইংরাজী আর সংস্কৃতের খই সব সময়েই ফুটছে তার মুখে। একটা স্কুল করেছে—নাম দিয়েছে প্রাচ্য-আর্য-শিক্ষা-কাণ্ড-পরিষৎ। ছেলের নাম রেখেছে মৃগাঙ্কমৌলি পতিতুণ্ডি। হরিণের নাম রেখেছে কপিঞ্জল। গুরুর নাম, আগমাচার্য ডমরু বল্লভ।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে আসতেই ঠাকুর বললেন, একি এখানে জাহাজ উপস্থিত? ছোটখাট ডিঙ্গি আসতে পারে, একেবারে জাহাজ!

এক একদিন গেরুয়া আর রুদ্রাক্ষ পরে মহিমাচরণ আসে। বাঘের ছাল পেতে বসে যায় পঞ্চবটীতে। যাবার সময় বাঘের ছালটিকে টানিয়ে রেখে যায় ঠাকুরের ঘরের দেয়ালে।

ঠাকুর বললেন, ও বাঘের ছাল এখানে কেন রাখে জানিস? লোকে দেখলে জিজ্ঞাসা করবে, তখন ওর নাম বলব তাতেই ওর তৃপ্তি। পাঁচজনে নামটা শুনতে পাবে।

ও মামি, ও কি হচ্ছে?

সারদা হকচকিয়ে উঠল।

দেখে হৃদয় হুমকি দিয়ে উঠল—

এই যে বইটইও বেশ যোগাড় হয়েছে দেখছি!

বই কেড়ে নিল হৃদয়।

একে মেয়েছেলে তার উপরে ঘরের বউ, পড়তে হবে না।

এই হৃদয়ের সঙ্গে একদিন যোগেশ্বরীর ঝগড়া লেগে গেল।

চিনু শাঁখারি এসেছে রামকৃষ্ণের প্রসাদ নিতে। ভক্তি দেখে যোগেশ্বরী মহাখুশি। প্রসাদ খাওয়া হলে এঁটো পরিষ্কার করতে গেল, যোগেশ্বরী দিল না। বলল, তুমি যাও আমি তুলব।

কিন্তু হৃদয় এলো তেড়ে। গাঁয়ের বামুন মেয়েরাও হৃদয়ের দিকে। যোগেশ্বরীকে শাঁখারির এঁটো ছুঁতে দেবে না।

হৃদয় বলল, এখানে এসব চলবে না।

কেন দোষ কি, চিনু ভক্ত লোক।

বটে! তাহলে আমাদের ঘরে তোমার জায়গা হবে না।

কথায় কথায় লেগে গেল বিষম ঝগড়া। যোগেশ্বরী ত্রিশূল উঁচিয়ে ধরল, হৃদয়ও বাঁশ নিয়ে উঠল।

হঠাৎ হৃদয় একটা কিছু ছুঁড়ে মারল। যোগেশ্বরীর কানে লেগে রক্ত পড়তে লাগল।

রামকৃষ্ণ কেঁদে উঠলেন, ওরে হৃদে এ তুই কি করলি?

যোগেশ্বরীর ও কি হলো উপর দিকে তাকায় আর ভয় পায়। লাহাবাবুর মেয়ে প্রসন্নকে বলল, ও প্রসন্ন এ আবার কি হলো! আমি এখন কোথায় যাব, বৃন্দাবন বা জগন্নাথ?

কয়েকদিন পরে যোগেশ্বরী কোথায় চলে গেল।

রাতের খাওয়া সেরে সবাই শুয়েছে। হঠাৎ রামকৃষ্ণ বাইরে উঠে এলেন। কি গো তোমরা আমাকে খেতে দেবেনা?

লক্ষীর মা বলল, সে কি এই তো তুমি দুধবার্লি খেলে!

কই খেলুম, এই তো দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি—

সবাই বুঝল রামকৃষ্ণের ভাবাবেশ হয়েছে।

কি আর করে থালায় করে চারটি মুড়ি এনে দিল। রামকৃষ্ণ মুখ ফিরিয়ে রইলেন। শুধু মুড়ি আমি খাব না।

কিন্তু ঘরে যে আর কিছু নাই।

রামকৃষ্ণের এক কথা, শুধু মুড়ি আমি খাব না।

ভাইপো রামলাল গেল বাজারে। মিষ্টি কিনে আনল।

মুড়ি আর মিষ্টি পেয়ে রামকৃষ্ণ খুশি।

একবার শ্বশুরবাড়ি গেছেন রামকৃষ্ণ। সেদিন কি একটা ক্রিয়া-কর্মে অনেক লোক খাওয়ান হয়েছে। রামকৃষ্ণ হঠাৎ বিছানায় উঠে বসলেন।

আমি খাইনি, ভীষণ খিদে পেয়েছে।

কি হবে ঘরে যে কিছু নাই, মেয়েরা মাথায় হাত দিয়ে বসল।

খুঁজে পেতে দেখা গেল, হাঁড়িতে কিছু পান্তা ভাত পড়ে আছে। কিন্তু জামাইকে কি তা দেওয়া যায়।

তাই নিয়ে এসো। হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন রামকৃষ্ণ।

সারদা কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, আর কিছু যে নাই।

আছে। রামকৃষ্ণ বললেন, দেখগে নিশ্চয় কিছু আছে।

সারদা ছুটলেন রান্নাঘরে।

দেখেন সত্যি একটা মৌরলা মাছ আর কিছু কাই পড়ে আছে। সারদা তাই এনে দিলেন।

রামকৃষ্ণ খুশি মনে খেতে লাগলেন।

একদিন শ্বাশুড়িকে দুঃখ করতে শুনে রামকৃষ্ণ বললেন, আপনার মেয়ের এত ছেলে হবে যে, মা ডাক শুনতে শুনতে অস্থির হতে হবে।

শ্রীমাও তাই বলে গেছেন, তা ঠিক হয়েছে। আমার এখন কত ছেলে।

কামারপুকুরে থেকে স্বাস্থ্য ফিরেছে রামকৃষ্ণের। এবার দক্ষিণেশ্বর ফিরতে হবে। বর্দ্ধমানের কাছে একটা মাঠের কাছে এসে রামকৃষ্ণ বললেন, ওরে হৃদে দেখ কেমন ফুল ফুটেছে। জানিস এ ফুলে শূলপানি প্রসন্ন হন। কিন্তু মাঠ ভর্তিতো বিষ্ঠা।

রামকৃষ্ণের বিষ্ঠা চন্দনে ভেদ নাই। ঐখানেই পূজোয় বসে পড়লেন।

হৃদয়ের মনে পড়ল।

একবার কাঙ্গালী ভোজন হচ্ছে, এক পাগল এসেছে। তার অবস্থা এমন যে কাঙ্গালীরাও তাকে তাড়িয়ে দিল। পাগল তখন এঁটো পাতা কুড়িয়ে খুঁটে খুঁটে খেতে লাগল।

রামকৃষ্ণ বললেন, ওরে হৃদে এ উন্মাদ নয়, জ্ঞানোন্মাদ।

হৃদয় ছুটল সাধুর পিছনে। সাধু তখন অনেকটা পথ চলে গেছে। হৃদয় পিছু নিল।

মহারাজ ভগবানকে কি করে পাব বলে দিন।

পাগল কোন উত্তর দেয় না।

হৃদয়ও নাছোড়বান্দা। পিছু পিছু যায় আর প্রশ্ন করে।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল পাগল। সামনের নর্দমার পচা জল দেখিয়ে বলল, গঙ্গা জল আর এই নর্দমার জল যেদিন তোর কাছে এক হবে।

হৃদয় ফের পিছু নিল।

মহারাজ আমাকে আপনার চেলা করে নিয়ে চলুন।

তবে রে শালা! পাগল ঢিল কুড়িয়ে নিল। হৃদয় ছুটে পালাল।

রামকৃষ্ণ পূজো শেষ করে ইষ্টিশানে যেয়ে দেখেন কলকাতার গাড়ি চলে গেছে।

তখন বলেছিলাম না, হৃদয় খিঁচিয়ে উঠল।

রামকৃষ্ণ নিরুত্তর, হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন।

দক্ষিণেশ্বরে এসে শুনলেন মথুরবাবুর স্ত্রী তীর্থে যাবেন। রামকৃষ্ণকেও সঙ্গে যেতে হবে।

১৮৬৮ সালের পৌষ মাসে রামকৃষ্ণ সকলের সঙ্গে তীর্থে বেরুলেন, যাবার আগে ভবতারিণীকে প্রণাম করে বলে গেলেন, মা তোমাকে এবার আর এক বেশে দেখে আসি।

সাতদিন লাগল কাশী যেতে। নৌকো করে গেলেন।

কাশীতে এসে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে দেখা হলো।—সেই ত্রৈলঙ্গ-স্বামী মাকে শ্মশানে পোড়াতে এসে, সে আর ফেরেনি।

কাশীতে একবার পদ্মাসনে গঙ্গার উপরে বসেছিলেন ত্রৈলঙ্গস্বামী, একজন ম্যাজিস্ট্রেট গঙ্গা দিয়ে নৌকা করে যাচ্ছিলেন। দৃশ্য দেখে তো চক্ষু চড়কগাছ। নৌকোয় তুলে নিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেটের কোমরে একটা তরোয়াল ঝুলছিল। ত্রৈলঙ্গস্বামী তরোয়াল চেয়ে নিলেন। হঠাৎ হাত থেকে গঙ্গায় পড়ে গেল!

ম্যাজিস্ট্রেট ভীষণ রেগে বকাবকি করতে লাগলেন। ঠিক করলেন, পুলিশে দেবেন। পারে এসে নৌকা লাগতেই জলে হাত ডুবিয়ে তিনটি তরোয়াল তুলে এনে ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে দিলেন, বললেন যেটা তোমার বেছে নাও।

## ষষ্ঠ স্তবক

কুলগুরুর কাছে দীক্ষা না নিয়ে রামকৃষ্ণের কাছে দীক্ষা নিলেন সিমলার রামদত্ত। পাড়ায় ঢি ঢি পড়ে গেল।

রাম ডাক্তারের যত কাণ্ড। আর গুরু পেল না। দক্ষিণেশ্বরে থাকে কৈবর্তদের পূজারী বামুন, তাকে গুরু করেছে। আর কেলেঙ্কারি কাকে বলে!

পাড়ার সুরেশ মিত্তির দুর্ধর্ষলোক।

বলল, ওহে রাম তোমার গুরুর কাছে নিয়ে চল। কেমন হংস একবার দেখে আসি।

রামদত্ত ভাল করে চেনে সুরেশ মিত্তিরকে। কেশব সেনের খোলের চামড়া কেটে দিয়ে বিডন স্কোয়ারে বক্তৃতা করতে দেয়নি।

রামদত্ত হাসল। ঠাকুরকেও ভাল করে জানে। মনে মনে বলল, চল না বাছা একবার, তারপর বোঝা যাবে কেরামতি।

সুরেশ মিত্তির বলল, শোন নিয়ে তো যাচ্ছ, কিন্তু তোমার রামকৃষ্ণ যদি শান্তি দিতে না পারে তবে কান মলে দিয়ে আসব, বলে রাখছি।

রামদত্ত বললেন, আচ্ছা।

এই রামদত্ত ফিরে এলো দক্ষিণেশ্বর থেকে।

বলে কান মলা দিতে গিয়ে কান মলা খেয়ে এলাম। আমাকে কৃপা করেছেন। নরেনেরও সে কথা।

নরেন ছিল আরো দুর্ধর্ষ।

তেড়েফুঁড়ে কথা কয়। পাদরিদেরও ছেড়ে কথা বলে না। হার্বার্ট, স্পেনসার, মুলার পড়ে। কথার দাপটে ভূত পালায়।

রামদত্ত বললেন, বিলে শোন, একদিন দক্ষিণেশ্বর চল, পরমহংস সেখানে আছেন, যাবি ?

সেটা তো মুখ্‌খু। নরেন বলল, এত বই পড়লুম্ কোন কিনারা হলো না। আর কিনারা করবে এক কৈবর্তদের পূজারী বামুন ? ও কি জানে ?

একবার গিয়েই দেখ না। বলল রামদত্ত।

বেশ যাব। কিন্তু যদি রসগোল্লা খাওয়াতে না পারে তবে কান মলে দিয়ে আসব।

কৈলাস বসুও একদিন ঠাকুরের কান মলে দিতে চেয়েছিলেন। রামদত্তকে বললেন, তুমি বলছ তাই যাব। ভাল লোক হয় তো ভাল না হলে কান মলে দেব।

রামদত্ত কৈলাসবাবুকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর এলেন। একজন লোক এসে বলল, ঠাকুর আমাকে পাঠিয়েছেন যে বাবুটি বলেছেন আমার কান মলবেন তাকে নিয়ে যেতে বলেছেন।

স্যার কৈলাস বসু স্তম্ভিত। সিমলেতে ঘরে বসে যে কথা হলো একটু আগে, সে কথা এখানে এলো কি করে ?

গিরীশবাবু আর এক কাঠি উপরে। মাতাল হয়ে ঠাকুরকে বাপান্ত করে গালাগাল দিল।

দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুর বললেন, গিরিশ আজ আমাকে যাতা বলে গালাগাল করেছে।

সবাই বলল, ওটা একটা পাষণ্ড। আপনি যান কেন ?

তাই বলে এ ব্যবহার করবে ? ঠাকুর রামদত্তকে বললেন।

রামদত্ত বলল, কেন খারাপ কি করেছে ?

শোন রাম কি বলে !

ঠিকই বলি। রামদত্ত বলল, গিরীশকে আপনি যা দিয়েছেন তা দিয়েই সে আপনার পূজা করে।

ঠাকুর হাসলেন।

বললেন, তার বাড়িতে আর যাওয়া বোধ হয় ভাল হবে না। তার পরেই বললেন,

রাম, গাড়ি আনতে বলো। ঠাকুর উঠে দাঁড়ালেন। রাম তুমি চল সঙ্গে, নরেন তুইও আয়।

ঠাকুরের খুব অসুখ সারদা থাকে দূরে দূরে।

শম্ভু মল্লিক চালাঘর বেঁধে দিয়েছে, সেঘরে থাকে সারদা। হঠাৎ একটি মেয়ে এসেছে কাশী থেকে, ঠাকুরের সেবা করতে। সেই কাশীর মেয়ে টেনে নিয়ে এলো সারদাকে।

একগলা ঘোমটা মুখে দাঁড়িয়ে আছে সারদা। সেই মেয়েটি হঠাৎ ঘোমটা খুলে দিল। কি দেখলেন ঠাকুর সেকথা ঠাকুরই জানেন! করজোড়ে স্তব করতে লাগলেন।

অর্ধেক রাতে উঠে শ্রীরামকৃষ্ণ তরকারি কাটতে লাগলেন। তা-ও দিগম্বর হয়ে। হৃদয় মুখিয়ে উঠল।

কেন ওসব সকালে করলে কি পালিয়ে যেত?

তুই তা বুঝবি কি। ঠাকুর বললেন।

আচ্ছা কিপ্টে যা হোক। হৃদয় ঝাঁজিয়ে বলে উঠল, ওটুকুন তরকারি তুমি কার পাতে দেবে?

তোদের আর কি বল! অপচয় করতে পারলেই হলো।

একজনকে ঠাকুর দাঁতন আনতে বললেন। লোকটি তিনচারটি দাঁতন ভেঙ্গে আনল। দেখে রামকৃষ্ণ বকে উঠলেন, শালা তোকে আনতে বললাম একটা আর এতগুলি নিয়ে এলি?

আর একদিন সেই লোকটির কাছেই শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁতন চাইলেন। লোকটি আবার ছুটল দাঁতন আনতে।

ঠাকুর বললেন, আগের দাঁতন নাই?

তবে তাই এনে দেনা শালা। আবার ভাঙ্গতে যাচ্ছিস? তুইকি একটা ডাল বানাতে পারিস যে পট পট করে ডাল ভাঙ্গবি?

সবাইকে পারা যায়। যায় না শুধু হৃদয়কে।

এক একদিন ঠাকুর রেগে এমন সব ভাষা ব্যবহার করেন, যে হৃদয় বলে ও মামা এসব কি বলছ, আমি তোমার ভাগনে।

এক একদিন ঠাকুর হাতের কাছে যা পান, তা দিয়েই কয়েক ঘা বসিয়ে দেন হৃদয়ের পিঠে। হৃদয় সহ্য করে।

হৃদয়ের কি খেয়াল হলো কুমারী পূজা করবে।

মথুরবাবুর নাতনীকে ফুল চন্দন দিয়ে পূজা করল।

খবর শুনে ত্রৈলক্য বিশ্বাস চটে গেল। মন্দিরের কাজ থেকে হৃদয়কে সরিয়ে দিলেন্।

নাম তার রাখতুরাম। ছাপরা জেলায় বাড়ি। ছেলেবেলায় বাপ মা মারা গেছে, কাকার কাছে মানুষ।

মাঠে মাঠে গরু চরিয়ে বেড়ায়। গান গায়—মনুয়ারে সীতারাম ভজন কর লিজিয়ে।

রাখতুরামের চাচাজির সম্পত্তি ঋণের দায়ে মহাজন নিলাম করে নিল।

ভাগ্যের সন্ধানে চাচাজি আর রাখতুরাম কলকাতায় এলো।

দেশের লোক ফুলচাঁদ মেডিকেল কলেজে রামদত্তের আরদালি—রাখতুরামকে রেখে দিল। বাবুদের বলে যদি কোন কাজে লাগিয়ে দেওয়া যায়।

রামদত্ত রাখল।

রামদত্ত নাম ছোট করে নিল, লালটু।

লালটুকে নিয়ে রামদত্ত একদিন দক্ষিণেশ্বর গেল।

ঠাকুরের নজর পড়ল।

তুই কেরে, তোর নাম কি? কে আনল তোকে এখানে?

রামদত্ত বলল, আমি।

ওরে এর শরীরে সাধুর লক্ষণ।

ঠাকুর লালটুকে স্পর্শ করলেন। দেখতে দেখতে লালটুর দুচোখ

জলে ভরে গেল।

একদিন রামদত্ত ঠাকুরকে মিষ্টি পাঠাবেন। লোক নাই, লালটু বলল, আমি নিয়ে যাব।

ঠাকুর বললেন, প্রসাদ খা।

লালটুর মনে কুণ্ঠা। বুঝতে পেরে ঠাকুর বললেন, দোষ নাই ঠাকুরের প্রসাদ, সব গঙ্গা জলে রান্না।

ঠাকুর ডাকেন লাটু, লেটো। বাংলা কথা জিভে পরিষ্কার আসে না।

ঠাকুর পড়াচ্ছেন বল 'ক'।

লাটু বলে 'কা'।

'কা' নয়রে, ঠাকুর বললেন, 'ক'।

লাটু আবার বলে, 'কা'।

দূর শালা! 'ক'কেই যদি 'কা' বলিস তবে 'কা'কে কি বলবি? যা শালা তোর এসব পড়ে কাজ নেই।

রামদত্তকে বলে লালটুকে ঠাকুর নিজের কাছে রেখে দিলেন!

ঠাকুর গাড়ু ছুঁতে পারেন না। গাড়ু নিয়ে লাটু দাঁড়িয়ে থাকে।

রামদত্তের বাড়ি ঠাকুর এসেছেন।

কলকাতাকে বড় ভয়।

বললেন, এখানে সব জ্ঞানী-গুণির বাস, এখানে কি আমি পাত্তা পাব?

ঠাকুরের হাত ভেঙ্গেছে। দেবেন্দ্র মজুমদার দেখতে এসেছে।

—কোথেকে আসা হচ্ছে?

—কলকাতা।

ঠাকুর শিউরে উঠলেন, তাহলে নিশ্চয় একজন গণ্যমান্য লোক।

কি, দেখতে এসেছ? না এমনি?

না আপনাকে দেখতে এসেছি।

আমার আর কি দেখবে বল! পড়ে গিয়ে হাত ভেঙ্গেছে।

ঠাকুর বললেন। দেখ দেখি সত্যি হাত ভেঙ্গেছে কিনা।

দেবেন্দ্র দেখে বললেন, আজ্ঞে সেরে যাবে।

ঠাকুর খুব খুশি। সকলকে ডেকে বললেন, শোন শোন ইনি বললেন হাত সেরে যাবে। ইনি যে সে লোক নন, কলকাতা থেকে এসেছেন।

রামদত্তের বাড়িতে পাড়ার সবাই এসে জমা হচ্ছে।

দক্ষিণেশ্বরের সেই সাধু এসেছে।

ঠাকুর জামা গায় দিয়ে এসেছেন. কলকাতায় এসেছেন তাই জামা পরে এসেছেন। কিন্তু কতক্ষণ এরকম ভদ্রলোক সেজে থাকতে পারা যায়। গায়ের জামা খুলে ফেললেন।

প্রথমে এলো লাটু, রামদত্তের লালটু, তারপর এলো রাখাল।

বসিরহাটে শিকরা গাঁয়ের জমিদার আনন্দমোহন জবরদস্ত লোক তার ছেলে রাখাল। বিয়ে হয়েছে, ঘরে স্ত্রী আছে। কিন্তু বাড়ী থাকে না। একদিন আনন্দমোহন পাকড়াও করলেন ছেলেকে। না ওখানে যাওয়া টাওয়া হবে না। ঘরে বন্ধ করে রাখলেন।

রাখাল আসে না। ঠাকুর কাতর হয়ে মা'কে ডাকেন, মা আমার রাখালকে এনে দে। আনন্দমোহনের কি মতি হয়েছে কে জানে। সেদিন আর ঘরে আটকে না রেখে নিজের চোখের সামনে বসিয়ে রেখেছেন। জমিদারির নথিপত্র দেখছেন। রাখাল আড়চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে দেখছে।

একটা কঠিন মামলা চলছে, আনন্দমোহন নথিতে ডুবে আছেন, রাখাল টুক করে খসে পড়ল। একছুটে একেবারে রাস্তায়, তারপর ছুটতে ছুটতে দক্ষিণেশ্বরে। কাজ থেকে মুখ তুলে আনন্দমোহন দেখেন রাখাল নাই।

যে মামলায় জেতার কোন আশা নেই, তার ফল উল্টো হয়ে গেল। ছেলের সাধুসঙ্গ করার ফল নয়ত? আনন্দমোহনের মনে ডাক

দিল।

যাক্ ছেলেটার উপরে আর পীড়ন করা হবে না, মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে রাখতে হবে।

ওরে রাখাল, ঐ তোর বাবা আসছে—দ্যাখ দেখি তাকিয়ে ঠাকুর বললেন। তাইত! রাখাল ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল।

ঠাকুর বললেন, ভয় নাই। বাবা এলে ভক্তি ভরে প্রণাম করিব —বাবা সাক্ষাৎ দেবতা।

আনন্দমোহন একাই ফিরে গেলেন। শুধু বলে গেলেন, মাঝে মাঝে ছেলেকে এক একবার পাঠাবেন দয়া করে।

রাখাল মাঝে মাঝে যায়।

আনন্দমোহনেরও কেমন ধারণা হয়েছে, এ সাধুকে ছাড়া হবে না।

রাখালের খোঁজ নিতে মাঝে মাঝে নিজেও আসেন আনন্দ মোহন। ঠাকুর খুব খাতির যত্ন করেন।

রাখালের সৎমা যখন দক্ষিণেশ্বরে আসতেন, তখন ঠাকুর রাখালকে বলতেন, ওরে মা'কে যত্ন করে সব দেখা, তা হলে তো মা বুঝবেন যে ছেলে আমাকে ভালবাসে।

কামারপুকুরে লক্ষ্মণকে দিয়ে রামকৃষ্ণ খবর পাঠালেন সারদাকে।

এখানে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। রামলাল মা-কালীর পূজারী হয়ে আমাকে আর খোঁজ নেয় না।

ছোট তক্তপোশে তাকিয়া ঠেশান দিয়ে বসে আছেন ঠাকুর।

ঠাকুর বলছেন, হাজার বিচার কর, তবু তার আন্ডারে আমরা আছি। মাষ্টার মশাই বললেন আর আমি আন্ডার কথাটি শিখলাম।

সারদা এসে দক্ষিণেশ্বরে নহবত ঘরে ঢুকল।

নিজের নাকের কাছে আঙ্গুল ঘুরিয়ে, গোল চিহ্ন করে, ঠাকুর ইসারা করে সারদার কথা বুঝিয়ে দেন। সারদার নাকে নথ আছে।

নহবতকে বলেন খাঁচা। লক্ষ্মী আর সারদাকে বলেন শুকসারী।

কালীমায়ের প্রসাদ এলে বলেন, ওরে রামলাল শুকসারীকে কিছু ছোলাটোলা দিয়ে আয়।

অন্ধকার হতেই ঠাকুর উঠে পড়েন।

নবতঘরের কাছে এসে হাঁক দেন।

ও লক্ষ্মী ওঠ। তোর খুড়িকে তোল।

শীতের রাত। এক একদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে মন চায় না। সারদা বলেন, চুপ করে থাক লক্ষ্মী, সাড়া দিবি না।

সাড়া না পেয়ে ফিরে যাবার পাত্র নয় রামকৃষ্ণ। দরজার ফাঁক দিয়ে বিছানায় জল ছিটিয়ে দেয়।

একদিন পঞ্চবটির কাছ দিয়ে যেতে ঠাকুর দেখলেন, লাটু ধ্যান করছে।

ঠাকুর হেঁকে উঠলেন, এই লোটা, কার ধ্যান করছিস ?

লাটু তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।

ঠাকুর বললেন, যা যা নবত ঘরে যা সেখানে সাক্ষাৎ ভগবতী বসে আছে, রুটি বেলে দে গিয়ে।

একদিন ঠাকুর অনুযোগ করে বললেন, অত খরচ করলে কি চলে ?

অভিমান হয় সারদার। যাবার সময় ঠাকুরের নজরে পড়েছে। ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

রামলাল তোর খুড়িকে গিয়ে শান্ত কর। ও রেগে গেলে আমার সর্বনাশ হবে।

সিঁথিতে বেণীবাবুর বাগানে গেছেন রামকৃষ্ণ। সন্ধ্যার পরে একা একা বেড়াচ্ছেন।

কতগুলি ভূত এসে বলল, তুমি এখানে এসেছ কেন ? চলে যাও, তোমার বাতাসে আমরা জ্বলে মরলাম।

ঠাকুর বাইরে চলে এলেন।

গাড়ি আনতে বললেন রামকৃষ্ণ।

কলকাতার রাস্তায় লাটুর সঙ্গে নরেনের দেখা।

তোদের ওখানের খবর কি রে? নরেন জানতে চাইল।

কালকেতো কুচ্ছু হলো। আপুনি কেনো গেল না? লাটু বলল, আজ আমার সঙ্গে চলুন।

ভাগ্। নরেন বলল, সামনে পরীক্ষা, আমার আর কাজ নাই, পাগলা বামুনের সঙ্গে দেখা করতে ছুটি!

পাগলা বামুন! লাটু অবাক হয়ে বলল, পাগলা কিসকো বোলছেন?

আর কাকে! কোমরে কাপড় থাকে না যার। নরেন বলল, নাম শুনলে যে ধেই ধেই করে নাচে আর ভেলকি দেখায়।

ভেলকি!

হ্যাঁরে হ্যাঁ! নরেন বলে, সে তুই বুঝবি না। রাখাল ওখানে যায়?

শুধু যায় না। লাটু বলে, থেকেও যায়।

একদিন রামদত্ত নালিশ করল ঠাকুরের কাছে, সুরেশ মিত্তির মদ খায়।

তোর তাতে কি! ঠাকুর বললেন, ওর ধাত আলাদা।

কারণ করে আনন্দ পেলে সুরেশ শুধু রামকৃষ্ণের কথা বলে।

একদিন রামদত্তকে বলল, তুই কত্তানো করিসনে। চল প্রভুর কাছে যাই। প্রভু যা বলবেন তাই হবে।

খাবার আগে মদের গ্লাস মাকে নিবেদন করে দেয় সুরেশ মিত্তির। বলে মা বিষটুকু তুই টেনে নে, মদটুকু আমি খাই। দরাজ গলায় গান ধরে।

রামকৃষ্ণ গেছেন ভবতারিণীকে দর্শন করতে। ফিরে এলেন টলতে টলতে। কথা এড়িয়ে গেছে।

মাতালের মত সারদার পা ঠেলে দিয়ে বললেন, ওগো আমি কি মদ খেয়েছি?

না মদ খাবে কেন! সারদা বলল, তুমি মাকালীর ভাবামৃত

খেয়েছ।

একটা মাতাল এসেছে রামদত্তের বাড়ি। নাম বিহারী ঘোষ।

—রামদাদা বলতে কি চাটের পয়সা নাই শুধু মদ খেয়ে বেড়াই।

—আজ সন্ধ্যায় আসবি তোকে আলুর দম আর লুচি খাওয়াব।

সন্ধ্যায় বিহারী দেখল বৈঠকখানায় ভিড়।

আমার লুচি আর আলুর দম কই বিহারী বলতে লাগল।

কে যেন বলে উঠল, যা পরমহংসকে প্রণাম কর গিয়ে।

কি খেয়াল হলো মাতালের, ঘরে ঢুকে ঠাকুরকে প্রণাম করল।

চরম চাট পেল মাতাল বিহারী ঘোষ।

হাঁটু দুটি উঁচু করে আসনখানির উপরে বসে আহার করে রামকৃষ্ণ। সবাই দাঁড়িয়ে দেখে।

যারা দাঁড়িয়ে দেখে সকলেরই অতীন্দ্রিয় ভাব।

ঠাকুর বললেন, আগে কাপড় ঠিক থাকত না। এখন প্রায় সে ভাবটা গেছে।

কয়েকজন যুবক ভক্ত বসে আছে। ঠাকুর কাপড় বগলে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন, বললেন, দেখ তোরা সব ইয়ং বেঙ্গল, তোদের পাল্লায় পড়ে আমি সভ্য হয়েছি। আজ কাল আমি সব সময় কাপড় পরে থাকি।

—এই আপনার কাপড় পরা?

—মাইরি আমি সভ্য হয়েছি।

গা ছুঁয়ে ঠাকুরকে ভক্তরা বুঝিয়ে দিল ঠাকুর কাপড় পরেন নি।

ঠাকুর করুণ স্বরে বলে উঠলেন, মনে করিতো সভ্য হব। কিন্তু মহামায়া যে বসন রাখতে দেয় না। সে কি আমার অপরাধ?

## সপ্তম স্তবক

সিমলে ষ্ট্রীটে সুরেশ মিত্তিরের বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর।

ঠাকুর বললেন, এখানে কেউ ভজন গাইতে পারে?

আছে বইকি! সুরেশ মিত্তির বলল, আমি তাঁকে ডেকে আনছি।

নরেনের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে সুরেশ মিত্তির ডাকলেন, ওরে বিলে, বাড়ি আছিস।

চল গাইতে হবে।

গানের নামে নরেন এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বলল, চলুন।

নরেনকে নিয়ে এলো সুরেশ মিত্তির।

ঠাকুর চমকে উঠলেন। এ যে সেই ঋষি।

একবার অপূর্ব দর্শন হয়েছিল ঠাকুরের।

সমাধি অবস্থায় উর্দ্ধে উঠে যাচ্ছেন ঠাকুর। জ্যোতির্ময় পথ ধরে চলতে চলতে পার হলেন পৃথিবী, পার হলেন জ্যোতিষ্কমণ্ডল, যতই যান ততই দেখেন দুপাশে বসে আছে দেব দেবী। আরো উর্দ্ধে উঠে ভাব রাজ্যের চরম সীমায় এসে থাকলেন। সেখানে একটি জ্যোতি-রেখা দিয়ে দুটি বিশাল রাজ্যকে আলাদা করে রেখেছে। খণ্ড আর অখণ্ডের রাজ্য। রামকৃষ্ণ অখণ্ডের রাজ্যে প্রবেশ করলেন। সেখানে দেব দেবী নাই। দিব্য দেহের অধিকারি হয়েও এখানে আসবার অধিকার তাদের নাই। অনেক নিচে ভাবলোকে তাদের বাস। সেই অখণ্ড লোকে সাতজন ঋষির বাস। রামকৃষ্ণ আশ্চর্য্য হলেন, যেখানে দেব দেবী আসতে পারে না, সেখানে এঁরা এলেন কি করে? বুঝলেন জ্ঞান প্রেম পবিত্রতায় এরা দেব দেবীকেও হার মানিয়েছে। হঠাৎ দেখতে পেলেন অখণ্ড লোকের জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের কিছুটা অংশ

ঘন হতে হতে এক দেব শিশুর আকার নিল। শিশুটি একজন ঋষির গলা জড়িয়ে ধরল। ঋষির ধ্যান ভেঙ্গে গেল। শিশু ঋষিকে বলল আমি চললাম, তুমি পরে এসো। ঋষি আবার ধ্যানস্থ হলেন। ঋষির দেহ থেকে একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে আলোক বর্তিকার মত পৃথিবীর দিকে নেমে গেল। রামকৃষ্ণ নরেনকে দেখেই চমকে উঠলেন, এযে সেই ঋষি আর শিশু নিজে।

নরেন ভজন গাইল।

এগিয়ে এলেন রামকৃষ্ণ। নিরীক্ষণ করে দেখলেন তারপর মিনতি করে বললেন, একবার দক্ষিণেশ্বরে এসো। কেমন আসবে তো?

নতুন গাড়ি কিনেছে সুরেশ মিত্তির। রামদত্তের দু'শ টাকা মাইনে হয়েছে। সবই নাকি ঠাকুরের কৃপায়। এসব শুনে নরেন হাসে।

সুরেশের বাড়িতে এলে আজ কাল রামকৃষ্ণকে ঘিরে ধরে ছেলে ছোকরারা।

একদিন সুরেশের বাড়ি একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারি বসেছিল।

রামকৃষ্ণকে আক্রমণ করল।

রামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কর?

—আপনার মত ছেলে বকাই না, আমি জগতের হিতকারি।

যিনি এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন, পালন করছেন তিনি কিছু বোঝেন না। তুমি সামান্য মানুষ হয়ে করছ জগতের হিত? ঈশ্বরের চেয়ে তুমি বেশী বুদ্ধিমান?

সেই সরকারি চাকুরের পিছনে লাগল পাড়ার ছেলেরা। দেখলেই বলে, কি হে জগতের হিত করছ নাকি? বেশ বেশ কতটা করলে?

নরেন এসেছে। ঠাকুর বললেন, এসেছিস, আর আসিস না কেন? একটা গান ধর। নরেন গান ধরল, মন চল নিজ নিকেতনে।

থামতেই আবার অনুরোধ, আর একটা গা।

গান শেষ হতেই ঠাকুর নরেনের হাত ধরলেন।

হাত ধরে নিয়ে এলেন উত্তরের বারান্দায়। নরেন ভাবল, বোধ হয় কিছু উপদেশ দেবে। কিন্তু রামকৃষ্ণকে দেখে অবাক হয়ে গেল।

তোর কি মায়া দয়া নাই? এত দেরি করে আসতে হয়? বিষয়ী লোকের কথা শুনে শুনে, কানে কড়া পড়ে গেল।

নরেন তাকিয়ে আছে উৎসুকভাবে।

ঠাকুর বললেন, মাকে সেদিন অনেক করে বললাম, মাগো, ভক্ত না পেলে কেমন করে থাকব পৃথিবীতে? তারপর কি হলো জানিস না বুঝি? কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লাম। মাঝরাতে তুই এসে আমাকে ঠেলে তুললি।

—কই আমি তো কিছু জানি না।

—না, জানিস না বইকি! ঠাকুর হাত জোড় করে বলতে লাগলেন, আমি জানি প্রভু তুমি কে? তুমি সেই পুরাণ ঋষি, তুমি মন্ত্র দ্রষ্টা পুরুষ, তুমি নররূপী নারায়ণ। তুমি আমার জন্য রূপ ধারণ করে এসেছ।

পাগল! পাগল না হলে কি মানুষের মধ্যে ঈশ্বর দেখে। কিন্তু পাগল বলে এক কথায় উড়িয়ে দেবার মত মন সায় দেয় না।

তুই একটু বোস তোর জন্য খাবার নিয়ে আসি, ঠাকুর বললেন।

ঠাকুর খাবার নিয়ে আসেন।

নরেন দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে।

ঠাকুর নরেনকে খাইয়ে দিলেন।

বল আবার আসবি? রামকৃষ্ণ বললেন, আসবি তো? এবার থেকে একা একা আসবি।

নরেন ঠাকুরকে ভাল করে দেখতে লাগল। পাগল কি এত সদালাপ করতে পারে? পাগলের কি ভাব সমাধি হয়? পাগল কি ঈশ্বরের জন্য পাগল হয়!

বাড়ি ফিরে এল নরেন।

যাই বল লোকটি বদ্ধ পাগল। নরেন ভাবল, না হলে বলে

ঈশ্বরকে দেখা যায়।

নরেন আবার এল দক্ষিণেশ্বরে। যতই পাগল ভাবুক। পাগলের আকর্ষণে আবার এল।

ঠাকুর বসেছিলেন।

নরেনকে দেখে খুশি হয়ে বললেন, এসেছিস্, আয়।

নিজের পাশে বসিয়ে বললেন, কিছু খাবি ?

একটু সরে বসে আছে নরেন। রামকৃষ্ণও সরে আসেন। না জানি আবার অদ্ভুত কি করে বসেন ? নরেন একটু ভয় পেল।

ঠিক তাই। রামকৃষ্ণ ডান পাটি নরেনের গায়ের উপর তুলে দিলেন।

মুহূর্তে কি যেন হয়ে গেল। ঘর, বাড়ি, দেয়াল, গাছ, পালা সব কিছুই ঘুরতে ঘুরতে শূন্যে উঠে যাচ্ছে।

নরেন কেঁদে উঠল, ওগো এ তুমি আমার কি করলে, আমার যে বাবা মা বেঁচে আছেন।

হেসে উঠলেন রামকৃষ্ণ।

আছে নাকি ? যখন তোর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল, তখনও জিজ্ঞাসা করেছি, তোর বাব-মায়ের কথা। আচ্ছা তবে এখন থাক্। আস্তে আস্তে হবে।

নরেন ভাবল লোকটা সম্মোহন বিদ্যায় ওস্তাদ।

একদিন ঠাকুর বললেন, আচ্ছা নরেন কেউ যদি তোর নিন্দে করে বেড়ায় তুই কি করিস ?

নরেন বলল, আমি মনে করব কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে।

শশধর পণ্ডিতকে দেখতে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গে নিলেন নরেনকে।

রামকৃষ্ণের হঠাৎ পিপাসা পেল। বললেন, জল খাব।

গৃহস্থ যদি সাধু সন্ন্যাসীকে কিছু না দেয়, তবে সাধুর নিজে থেকে কিছু চেয়ে নিতে হয়। না হলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়।

একজন তিলক ফোঁটা কাটা ভক্ত গ্লাসে করে জল নিয়ে এলো।

ঠাকুর খেলেন না। সকলে ভাবল বোধহয় গ্লাসে কোন নোংরা লেগে থাকবে।

আর একজন ভক্ত জল এনে দিল। ঠাকুর খেলেন।

সকলে ভাবল বোধহয় গ্লাসে তাহলে সত্যিই কিছু ছিল।

নরেন কিন্তু মেনে নিল না। ভাবল ভিতরে কোন রহস্য আছে।

ঠাকুর চলে গেলেন। নরেন গেল না।

নরেন তিলকধারীর ছোট ভাইকে খুঁজে বের করে প্রশ্ন করল, তোমার দাদাটির স্বভাব-চরিত্র কেমন হে?

ছোট ভাই মুচকি হেসে বলল, ছোট ভাই হয়ে দাদার কথা আর কি বলি বলুন। নিমেষে নরেন বুঝে ফেলল সব। কিন্তু ঠাকুর বুঝলেন কি করে? তাহলে সত্যি কি তিনি অন্তর্যামী?

ভগবতী ঝি এসে দূর থেকে ঠাকুরকে প্রণাম করল।

ঠাকুর বললেন, এখন তো বয়স হয়েছে। টাকা পয়সা আছে, এবার সাধু-সন্ন্যাসীদের একদিন ভোজ দে।

—তা আর কি করে বলি।

—কাশী, বৃন্দাবন দেখা হয়েছে?

—কই আর হলো?

—তা হলে আর কি করলি?

—একটা ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছি। ঘাটে আমার নাম লেখা আছে।

ভগবতী হঠাৎ ঠাকুরের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। ঠাকুর যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলেন।

ঘরের কোনে গঙ্গাজল, সেদিকে ছুটে গেলেন ঠাকুর।

বরাহনগরে বেণী সা গাড়ি ভাড়া খাটায়। ঠাকুর ডাকলেই গাড়ি পাঠিয়ে দেয়।

যত্ন মল্লিক গাড়ি ভাড়া দু'টাকা চার আনার বেশি দেবে না। কিন্তু তিন টাকা কড়ারে গাড়ি ঠিক হয়েছে। এই বাড়তি টাকা কে দেয়?

আমাকে বিদ্যাসাগরের কাছে নিয়ে যাবে? একদিন ঠাকুর বললেন, আমার বড় ইচ্ছে বিদ্যেসাগর দেখব।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন পরমহংস হে, গেরুয়া টেরুয়া পরে নাকি?

—না লালপেড়ে কাপড় পরেন। গায়ে জামা পায়ে চটিজুতা দেন, রাসমণির কালীবাড়িতে থাকেন। ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু জানেন না।

বিদ্যাসাগর খুশি হলেন। শনিবার চারটেয় নিয়ে এসো।

রামকৃষ্ণ এলেন, সঙ্গে ভবনাথ আর হাজরা।

উঠোন পেরিয়ে যেতে যেতে ঠাকুর বললেন, ওরে আমার জামায় বুতাম নাই, খারাপ হবে না তো?

ভবনাথ বলল, না আপনার কোন অপরাধ হবে না।

বেশ! ঠাকুর খুশি হয়ে বললেন, তবে আর কি।

রামকৃষ্ণ ঘরে ঢুকতেই বিদ্যাসাগর উঠে দাঁড়ালেন।

রামকৃষ্ণ তাকিয়ে আছেন এক দৃষ্টিতে, হঠাৎ বললেন জল খাব।

একটি বেঞ্চে বসেছিলেন ঠাকুর। সে বেঞ্চে আর একটি ছেলেও বসেছিল।

ঠাকুর বললেন, এ ছেলের বড় সংসারাসক্তি। এ অবিদ্যার ছেলে।

এ ছেলেটি কেমন, বিদ্যাসাগর আর একটি ছেলেকে দেখিয়ে বললেন।

ভাল। ঠাকুর বললেন ফল্গুনদীর মত, একটু খুঁড়লেই জল পাবে।

বিদ্যাসাগর মাষ্টার মশাইকে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু খেতে দিলে ইনি খাবেন কি?

আসুন, খাবেন। মাষ্টার মশাই বললেন।

বিদ্যাসাগর ব্যস্ত হয়ে বাড়ির মধ্যে গেলেন। এক থালা মিষ্টি নিয়ে এলেন।

এটুকু খেয়ে ফেলুন। বিদ্যাসাগর বললেন, বর্ধমান থেকে এনেছি।

ঠাকুর খেতে খেতে বললেন, এত দিন খাল, বিল, হ্রদ, নদী দেখেছি আজ একেবারে সাগরে এলাম।

বিদ্যাসাগর হাসতে হাসতে বললেন, তা হলে একটু নোনা জল নিয়ে যান।

না গো না, ঠাকুর বললেন, তুমি হচ্ছ ক্ষীরসমুদ্র। তুমি তো সিদ্ধ গো!

আমি সিদ্ধ? চমকে উঠলেন বিদ্যাসাগর। আমি তো ভগবানের জন্য সাধনা করিনি।

ঠাকুর হাসলেন।

বললেন, আলু-পটল, সিদ্ধ হলে কি হয়? নরম হয়। তুমিও নরম হয়েছ। তোমার এত দয়া, তুমি সিদ্ধ নয়তো কে সিদ্ধ?

ঠাকুর বলছেন, বুঝলে বিদ্যেসাগর, ব্রহ্ম কি বলে বুঝান যায় না। ব্রহ্ম হচ্ছে অনুচ্ছিষ্ট। রসনা দিয়ে কেউ তাকে উচ্ছিষ্ট করতে পারে না।

বিদ্যাসাগর আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন।

বাঃ বেশ কথা! একথা তো কোথাও শুনিনি। একটা নতুন কথা শুনলুম। যারা ব্রহ্মজ্ঞানী? বিদ্যাসাগর প্রশ্ন করলেন।

তারা নুনের পুতুল। ঠাকুর বললেন, তারা সমুদ্রের জল মাপতে নামলে নিজেরাই গলে যাবে। তখন কে কার খবর নেবে বল? তুমি সব জানো, তবে খবর নাই।

বিদ্যাসাগর বললেন, তা কখনো হয়?

হ্যাঁ গো হয় বইকি! অনেক বাবু জানে না চাকর বাকরের নাম কি? ঠাকুর বললেন, একবার যেয়ো দক্ষিণেশ্বরে।

যাব বইকি! বিদ্যাসাগর বললেন, আপনি এলেন আর আমি যাব না?

কেশব সেনকে রামকৃষ্ণ প্রথম দেখেন আদি সমাজে। একদিন মসজিদ ঘুরে, গির্জা ঘুরে, গেলেন ব্রাহ্মসভায়। গিয়ে দেখেন বেদীর উপরে চারপাশে অনেক লোক, মাঝখানে কেশব। ধ্যান করছেন চোখ বুঁজে।

সকালবেলায় কেশব তার ভক্তদের নিয়ে পুকুরের বাঁধাঘাটে বসে আছেন। হৃদয় এসে বলল, আমার মামা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

সবাই রামকৃষ্ণকে দেখবার জন্য উদগ্রীব। দেখে হতাশ হলো। এত লোকের মাঝে রামকৃষ্ণ কিন্তু বুঝে নিয়েছেন, কে কেশব সেন। কেশবের কাছটিতে চলে এলেন। কেশব তন্ময়ের মত তাকিয়ে রইলেন ঠাকুরের দিকে।

ঠাকুর বললেন, তোমার কাছে শুনতে এসেছি। তোমরা নাকি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেয়েছ। বল না একটু শুনি।

কেশব বলল, আপনি বলুন।

আমি বলব ? ঠাকুর গান আরম্ভ করলেন।

গাইতে গাইতে রামকৃষ্ণের সমাধি হলো। কেশবের ভক্তরা ভাবলেন এ বোধ হয় ঢং। না হয় লোকটার বোধ হয় মৃগি আছে।

হৃদয় রামকৃষ্ণের কানের কাছে, হরি ওঁ বলতে লাগল।

ভবতারিণীর মন্দিরে গিয়ে ভাবাবস্থায় ঠাকুর বললেন, করছিস কি মা এত লোকের ভিড় কি আনতে হয় ? নাইবার খবার সময় নাই। গলাতো ভেঙ্গে ঢাক। এবার ফুটো হয়ে যাবে। এতসব অসার লোকদের আনিস কেন ? কিছু ভাল লোক পাঠাতে পারিস না ?

নরেনকে বোঝাবার জন্য উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ।

অন্যেরা কলসী, ঘট, নরেন জালা।

অন্যেরা ডোবা, পুকুর, নরেন দীঘি।

নরেন যেন খাপ খোলা তরোয়াল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বিদ্যাসাগরকে ঠাকুর বলতেন, ক্ষীরসমুদ্র।

গিরীশকে বলেছেন, রসুন গোলা বাটি।

বাবুরামকে বলতেন, নতুন হাঁড়ি।

শশধর পণ্ডিতকে বলতেন, দ্বিতীয়ার চাঁদ

শ্রীমাকে বলতেন, ছাই চাপা বেড়াল।

নিজেকে বলতেন, ঢাল নাই তরোয়াল নাই শান্তিরাম সিং।

বরাহনগরে বেড়াতে এসেছে মহেন্দ্র গুপ্ত। মেট্রোপলিটন স্কুলের হেডমাষ্টার। বন্ধু সিদ্ধেশ্বর মজুমদারের কাছে এসেছেন।

সিদ্ধেশ্বর বলল, চল দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির বাগানে সেখানে একজন সাধু আছে, দেখে আসব চল।

মহেন্দ্রকে দেখে ঠাকুর বলে উঠলেন,—তুমি এসেছ? আচ্ছা বসো আমার কাছে। হঠাৎ বলে উঠলেন, কেশব কেমন আছে, তার খুব অসুখ।

—আমিও শুনেছি বটে।

—তোমার কি বিয়ে হয়েছে?

—আজ্ঞে হাঁ—হয়েছে?

—হয়েছে! যেন যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ।

ওরে রামলাল, বিয়ে করে ফেলেছে।

আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলে হয়েছে?

আজ্ঞে হয়েছে একটি।

যাঃ ছেলেও হয়ে গেছে! ঠাকুর বললেন, কি আর হবে। তোমার মধ্যে ভাল লক্ষণ ছিল! আচ্ছা তোমার পরিবারটি কেমন? বিদ্যাশক্তি না আদ্যাশক্তি।

মহেন্দ্র ভরসা পেয়ে বলল, আজ্ঞে ভাল তবে অজ্ঞান।

ঠাকুর বিরক্ত হলেন আর তুমি বুঝি একজন মস্ত জ্ঞানী? শোন অনেক জানার নাম অজ্ঞান, এক জানার নাম জ্ঞান।

একদিন ঠাকুর শ্রীমাকে বললেন, হ্যাঁ গো, তোমার হাতখরচ কত টাকা লাগে?

হঠাৎ একি প্রশ্ন, শ্রীমা চুপ করে রইলেন।

ঠাকুর বললেন, রাত্রে তুমি ক'খানা রুটি খাও?

শ্রীমা এবার লজ্জায় পড়লেন। খাবার কথায় সব মেয়েরাই লজ্জা পায়।

মৃদুস্বরে বললেন পাঁচ ছ'খানা।

—তাহলে আর কি, পাঁচ ছ' টাকা হলেই তোমার চলে যাবে।

ঠাকুরের অসুখ বেড়েছে।

শ্রীমা'র মন চঞ্চল।

মনে পড়ল, একদিন ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, দেখ যখন দেখবে আমি যার তার হাতে খাচ্ছি, কলকাতায় রাত কাটাচ্ছি, খাবার আগে নিজের খাবার অন্য কাউকে দিয়ে দেব বুঝবে আমি দেহ রাখব।

ঠাকুরকে কলকাতায় নিয়ে গেছে।

শ্রীমার মনে পড়ল—খাবার আসে, একদিন খাবার সবটা ঠাকুর নরেনকে দিয়েছিলেন।

শ্যামপুকুর স্ট্রীটের বাহান্ন নম্বর বাড়ি। দক্ষিণেশ্বর থেকে শ্রীমাকে এবাড়িতে আনা হয়েছে। ঠাকুর আছেন, সেবা করতে হবে।

রোগের প্রকোপ বেড়েই চলল। ঠাকুরকে কাশীপুরে নিয়ে আসা হলো।

যত দিন যায় ঠাকুর তত দুর্বল হয়ে পড়েন। ভক্তরা মুসড়ে পড়েছে। শ্রীমা সান্ত্বনা দেন।

দক্ষিণেশ্বরে যে ভক্তরা যেত, সকলকেই শ্রীমা নিজের সন্তান ভাবতেন। ঠাকুর বলে দিয়েছিলেন, ওদের আহারে সংযমী হতে হবে। শ্রীমার উপরে আদেশ দিলেন রাখাল ছ'খানা, লাটু পাঁচ খানা, বুড়ো গোপাল আর বলরাম চারখানা করে রুটি খাবে।

ঠাকুর মহাপ্রয়াণের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছেন।

রোগের উপশম হয় না বরং বেড়েই চলেছে।

শ্রীমা তারকেশ্বরে গেলেন হত্যা দিতে।

হত্যা দিয়ে পড়ে আছেন। একদিন শুনতে পেলেন কে যেন পর পর হাঁড়ি সাজিয়ে রেখে ভেঙ্গে ফেলেছে।

শ্রীমা ফিরে এলেন।

সমস্ত জেনেও ঠাকুর প্রশ্ন করলেন,—কি গো হোলা না তো?

শ্রীমা জবাব দিলেন না।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের শ্রাবণের শেষে ঠাকুর শ্রীমাকে ডেকে পাঠালেন।

—যেন আমার মনে ব্রহ্মভাবের উদয় হচ্ছে।

শ্রীমা বিচলিত হয়ে উঠলেন। বুঝলেন শেষের সে সময় এসে গেছে।

ঠাকুর বললেন, দেখ আমি যেন কোথায় যাচ্ছি। যেন কোন অনন্তের দিকে যাত্রা করছি।

শ্রীমা সব বুঝলেন, কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

ঠাকুর বললেন, কেঁদনা, এরা রইল। লক্ষ্মীকে কাছে রাখবে। তুমি যেমন আছ তেমন থাকবে।

ভক্তদের দেখিয়ে ঠাকুর আবার বললেন, এরা রইল এদের দেখো।

তোমার অনেক কাজ বাকী আছে। আমি আর কি করেছি এর শতগুণ তোমাকে করতে হবে।

ধীরে ধীরে রাত্রি গভীর হতে লাগল।

মধ্যরাত্রি, ঠাকুর সমাধিস্থ হলেন।

এ মহা সমাধি আর ভাঙ্গল না।

ঠাকুর লীলা সংবরণ করলেন।